Registration No.: SO197407 of 2012-2013

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

পঞ্চদশ বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖মার্চ ২০২৫

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

মানব সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

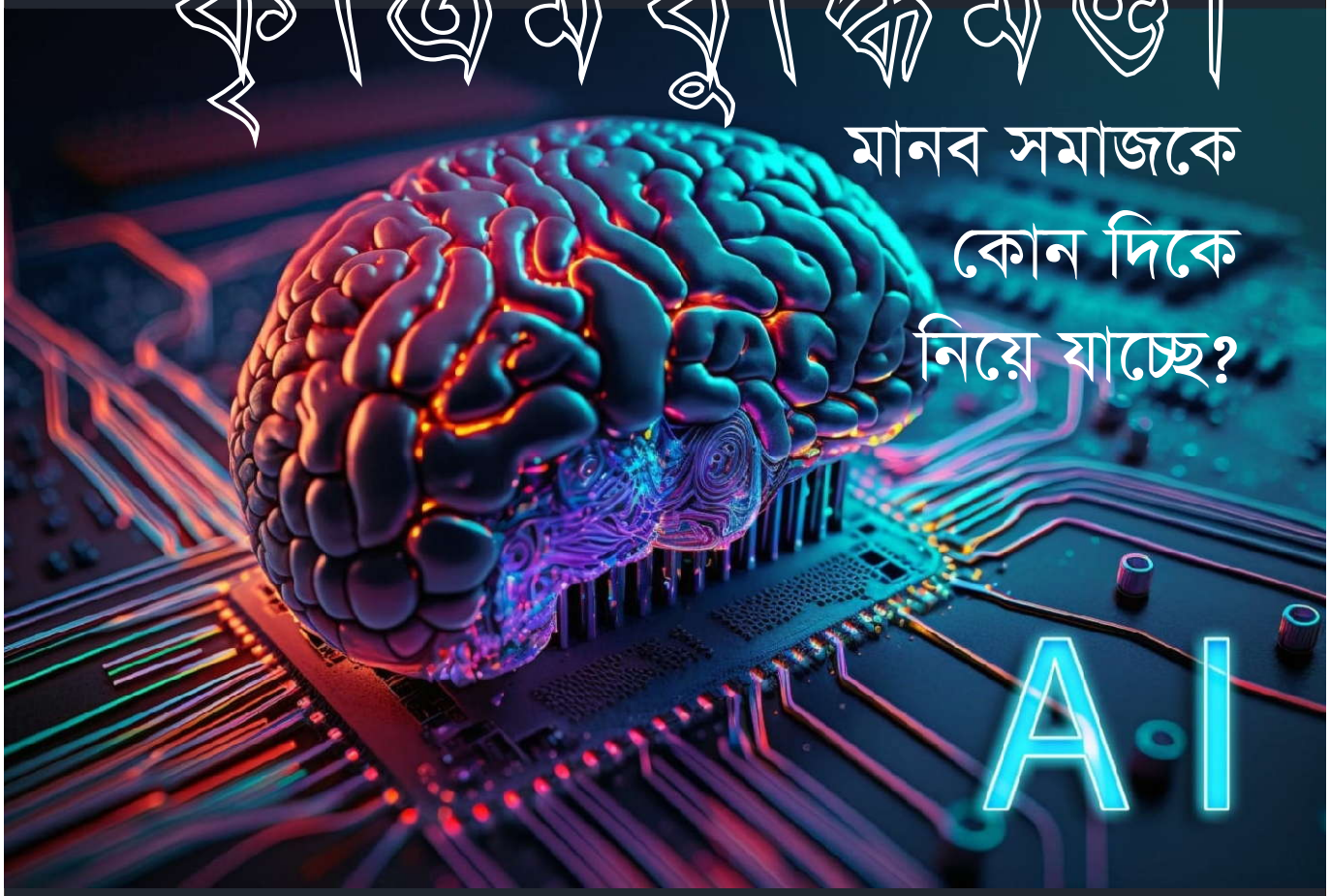

- বুচ-সুনীতাদের প্রত্যাবর্তন এবং ...
- জিওর্দানো ব্রুনো, বর্তমান সময় ও আগামী পৃথিবী

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ বিশেষ রচনা ঃ ৫
◆বুচ-সুনীতাদের প্রত্যাবর্তন এবং ..
◆কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানব সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

◈ চয়ন ঃ ৬
◆শহীদ ভগৎ সিং-এর বিজ্ঞান মনস্কতা

◈ বিজ্ঞানের খবর ১২

◈ প্রশ্ন ও উত্তর ঃ ১৫
◆মানুষের ত্বকে কেন কেবল ভিটামিন D তৈরি হয়?

◈ সংগঠন সংবাদ ১৬

◈ সমাজ দর্পণ ঃ ২২
◆শ্রমজীবী মানুষের জীবন মানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষা!

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ ২৫
◆জলবায়ু সম্মেলনের জন্য...আমাজনের জঙ্গল সাফ করল!

◈ সমাজ বিজ্ঞান ঃ ২৬
◆পিতৃতন্ত্র – শোষিতশ্রেণীর অন্যতম প্রতিপক্ষ

◈ অতিথি কলম ঃ ৩০
◆জিওর্দানো ব্রুনো, বর্তমান সময় ও আগামী পৃথিবী

◈ সমীক্ষা ঃ ৩৩
◆বেলগাছিয়া ভাগাড়–শাসকের পরিবেশ প্রেমের প্রকৃত রূপ

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ৩৪
◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের কর্মকান্ড ঃ ৩৫
◆মধুসূদন গুপ্ত ঃ ... শবব্যবচ্ছেদের পথিকৃৎ

◈ কবিতা ঃ ৩৯
◆পুণ্যের লোভ

সম্পাদকীয় ঃ

মহাকুম্ভে পুণ্যলাভ!

২০২৪-এ অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে তৈরি করা মন্দিরে রামলালার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সরগরমী ঠান্ডা হওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল প্রস্তুতি। এলাহাবাদে (নাম বদলে প্রয়াগরাজ) **মহাকুম্ভ**। গত ১৪ই জানুয়ারি থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ৪৫ দিন ধরে চলা এই মেলায় **৪ হাজার হেক্টর** এলাকা সংরক্ষিত করা হয়। প্রস্তুতির বাজেট ছিল ৬,৩৮২ কোটি টাকা। পরবর্তীতে খরচ দেখানো হয়েছে **৭৫৩৫** কোটি টাকা। শুরুতে দাবি করা হয়েছিল ৫০ কোটির বেশি মানুষ ঐ মেলায় উপস্থিত হয়ে গঙ্গা-যমুনা (এবং অদৃশ্য সরস্বতীর) সঙ্গমে ডুব দিয়ে পুণ্যলাভ করবেন।

সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় খরচ ও ব্যবস্থাপনায় সংঘটিত কুম্ভ মেলার উৎপত্তি ও তাৎপর্য **'ব্যাখ্যার অতীত'!** অষ্টম শতাব্দীর হিন্দু ধর্মীয় সংগঠক (আদি) শংকরাচার্য কুম্ভ মেলা নামক ধর্মীয় অভিযান সংগঠিত করেন – এমন কিছু প্রামাণ্য তথ্য বর্তমান। তা সত্ত্বেও দাবি করা হচ্ছে সেটা কেবলমাত্র 'আধুনিক' যুগে সুসংগঠিত করার তথ্য। প্রকৃতপক্ষে কুম্ভমেলার সূত্রপাত পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনের সাথে যুক্ত। সেটা কত বছর আগে? বলা সম্ভব নয়। অনাদি অতীত থেকে চলে আসছে।

১৪৪ বছর পর পর **'মহাকুম্ভ'** যোগ এমনই ব্যাখ্যার অতীত। ১২ বছর পর পর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত পূর্ণকুম্ভের ১২তম সংস্করণটিতে (অর্থাৎ ১২×১২=১৪৪ বছর) গ্রহ নক্ষত্রগুলি জ্যোতিষ গণনা অনুসারে বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয়ে সৃষ্টি করে মহাকুম্ভ। তেমনই একটি সংঘটিত হল এবছর ২০২৫-এ। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যার অতীত বিষয় হল ১৯৫৪, ১৯৭৭ ও ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলাগুলিকেও ১৪৪ বছর পর পর সংঘটিত 'মহাকুম্ভ' রূপে প্রচার করা হয়েছিল।

'কুম্ভমেলার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সমগ্র ভারতীয় জাতির সম্প্রীতি এবং ঐক্যের মধ্যে। ধনী-দরিদ্র, দেশী-বিদেশী, উঁচু-নিচু জাত সকলেই বাধাবন্ধনহীন হয়ে স্নান করে যা সামাজিক সাম্যের প্রতীক।' এমন তাৎপর্যের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিশেষভাবে এইবার কুম্ভমেলায় **'অসনাতনী'**দের যে প্রবেশের অনুমতি নেই তা বহুপূর্বেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। গত শ্রাবণ মাসে কাঁওয়ার যাত্রার সময় রাস্তায় খাবারের দোকানের মালিকের নাম বড় বড় করে লেখার নির্দেশ

দেওয়া থেকে এর সূত্রপাত। কুম্ভমেলায় এমনকি এটাও বলা হয়েছিল সনাতনীদের গাড়ি চালক যদি মুসলিম হয় তবে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের নিতে হবে। মেলা পরিসরের মোড়ে মোড়ে বাণী প্রদর্শন করা হয়েছে **'মদ খাওয়া পাপ, ডিম খাওয়া পাপ, মাংস খাওয়া পাপ'** এবং অনিবার্যভাবে ছিল **'হম হিন্দুরাষ্ট্র বনায়েঙ্গে'**। স্বীকৃত 'টেন্ট সিটী'তে থাকা সাধারণের আয়ত্বের বাইরে। ব্যাপকের স্থান হয় পথে। সারা দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে যে হাজার হাজার সাফাই কর্মীকে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদের একটু ভদ্রস্থ খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা হয়নি। সর্বোপরি সাধারণ ও ভি.আই.পি'দের স্নান করার ঘাট আলাদা। ২৮-২৯শে জানুয়ারি প্রায় আধ ডজন জায়গায় পদপিষ্ট হয়ে যে বহুসংখ্যক মারা গিয়েছেন ও নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন তার প্রধান কারণ হল 'শাহী স্নানের' জন্য ভি.আই.পি'দের গাড়ি অনায়াসে সচল রাখার জন্য ৩০টা পন্টুন পুলের বেশিরভাগ বন্ধ রাখা। এই ভি.আই.পি'দের মধ্যে ছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, পতঞ্জলী সম্রাট বাবাজী থেকে রক ব্যান্ড তারকা ক্রিস মার্টিন। ৪৫ দিন ধরে চলা মেলায় এই প্রকার ভি.আই.পি'রা রক্ষী পরিবৃত হয়ে একা অথবা সপরিবারে ছবি তুলেছেন। ৫০ কোটির ভিড়ের এক কণাও দেখতে পাওয়া যায়নি।

ধর্ম-খাদ্যভাস-রাজনৈতিক, ধর্মীয় পদমর্যাদা সহ যাবতীয় প্রভাব-সর্বোপরি অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে এমন প্রকাশ্য বিভেদ-বিদ্বেষ কিভাবে সম্প্রীতি, ঐক্য এবং সাম্যের প্রতীক হয় তা প্রকৃত পক্ষেই **ব্যাখ্যার অতীত।**

মহাকুম্ভে প্রতিদিন কত মানুষ অংশ নিয়েছেন তার প্রতিনিয়ত ধারাবিবরণী শোনা গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা **৬৬.৩০ কোটি** ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকা জানিয়েছে। বাকিরাও প্রায় তেমনই হিসেব পেশ করেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দর্শনার্থীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে বলে সরকারী সূত্রগুলিও দাবি করেছে। এর অর্থ দেশের মোট **৩০ কোটির** কিছু বেশি (আনুমানিক) হিন্দু পরিবারের প্রত্যেকটি থেকে গড়ে ২ জন ঐ মেলায় অংশ নিয়েছিলেন। যা **ব্যাখ্যার অতীত** তা হল মাত্র ৪৫ দিনে দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেককে এত বড় দেশের একটি মাত্র শহরে গণনা করা গেলে তিন বছর ধরে আদমশুমারির কাজটা কেন করতে পারা যায় না!

মহাকুম্ভ আয়োজন বহু ব্যাখ্যাযোগ্য বিষয়কেও তুলে ধরেছে।

২৮-২৯শে জানুয়ারি পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার সাথে সাথে এলাহাবাদের জনসেনগঞ্জ, রোশনবাগ, হিম্মৎগঞ্জে, খুলদাবাদ, রাণীমন্ডী, শাহগঞ্জ ইত্যাদি মুসলিম বহুল এলাকার সাধারণ মানুষ নিজেদের ঘরের দরজা পীড়িত-আহত-বিধ্বস্ত মানুষের জন্য খুলে দেন। মেলা এলাকার থেকে ১০ কিলোমিটার দূর খুলদাবাদ সব্জি মন্ডী মসজিদ, বড়া তাজিয়া ইমামবাড়া, হিম্মৎগঞ্জ দরগাহ, চক মসজিদে মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয়।

শাসনতন্ত্রের শীর্ষ ও কেন্দ্র থেকে বিদ্বেষ ও বিভাজনের যে অভিযান প্রতিনিয়ত চলছে সাধারণ শ্রমজীবী জনগণ যথাসাধ্য তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন।

এটাও ব্যাখ্যাযোগ্য যে কখন বড় বড় জনসমাগমগুলি ভয়ংকর ও প্রাণঘাতী হয়ে পড়ে তার সহজ বৈজ্ঞানিক অনুমান এবং অতি কম খরচে তার প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা মজুত থাকলেও মহাকুম্ভ থেকে হজ সমাবেশ কোথাও তার প্রয়োগ হয় না। বিজ্ঞান বলে ভিড়ের ঘনত্ব হল পদপিষ্ট হওয়ার কারণ। প্রতি বর্গমিটারে ৫ জন জড়ো হলে আঘাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ৭ জন বা তার বেশি হলে মৃত্যু ও গুরুতর আঘাত প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিষয় গোটা ভিড়ের চারপাশে উন্মুক্ত পরিসর যথেষ্ট আছে কিনা, কম হলে অতি দ্রুত ভয়ংকর আকার ধারণ করবে। এজন্য রেলিং বা বাধার পেছনে বিপুল সমাগম হলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে যায়।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করে বলা হয় 'ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে, অথচ ভিড়ে সামিল ব্যক্তিদের ভূমিকা অতি নগণ্য। একবার বিপজ্জনক ঘনত্বে ভিড় পৌঁছে গেলে ভিড়ের মধ্যেকার কেউই কার্যত তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তারা নিজেরা ভাল করে নিঃশ্বাসও নিতে পারে না। প্রবেশ ও প্রস্থানের যথা সম্ভব বেশি পৃথক পথ, প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় বিভাজন, যাওয়া আসার পথ মসৃন ও আবর্জনা মুক্ত রাখার মত অতি সাধারণ কম খরচের ব্যবস্থাপনা বিরাট সমাবেশকেও সুশৃঙ্খল রাখতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) যুক্ত প্রযুক্তির হাজার হাজার ক্যামেরা ও অন্যান্য ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি লাগে না। এলাহাবাদে সঙ্গম নোজ ও অন্যত্র এমনকি পরে নয়াদিল্লি রেল স্টেশনের ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায় এর ছিঁটেফোঁটা ব্যবস্থাও করা হয়নি।

উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সঞ্জয় নিষাদ মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে বলেন 'এমন জনসমাগম ও ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না। কিছু ছোটখাটো ঘটনা এখানে ওখানে ঘটতে পারে।' অখিল ভারতীয় আখাড়া পরিষদের সভাপতি মহন্ত রবীন্দ্র পুরী মহাশয় বলেন 'যারা পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় সরকারকে দায়ী করছে তারা সনাতন বিরোধী, হিন্দুদের

ঐক্যে খুশি নয়। বামপন্থী ইউ টিউবাররা ভুয়ো সাধু সন্তদের দিয়ে হিন্দুদের বদনাম করছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ২৯ তারিখ পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা এই শক্তিগুলোর কাজ হতে পারে, অতএব কুম্ভমেলা সংগঠকদের কাছে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ব্যাখ্যাযোগ্য।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা। তারা ১২ থেকে ১৯ জানুয়ারি কুম্ভমেলার বিধিবদ্ধ এলাকায় গঙ্গা, যমুনা ও সঙ্গমস্থলে জলের নমুনা পরীক্ষা করে গুণবত্তা মূল্যায়ন রিপোর্ট জাতীয় গ্রীন ট্রাইব্যুনালের কাছে পেশ করে। পর্ষদের মানদন্ড অনুযায়ী প্রতি ১০০ মিলিলিটার জলে কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার পরিমাণ ৫০০ এম.পি.এন (সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সংখ্যা) এর বেশি হলে তা স্নানের যোগ্য থাকে না। কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া অপরিশোধিত পয়ঃপ্রণালীর জল এবং প্রত্যক্ষভাবে মানুষ ও পশুর মলের উপস্থিতি প্রমাণ করে। নমুনা পরীক্ষায় দেখা যায় গঙ্গার জলে সর্বোচ্চ ৭ লক্ষ এম.পি.এন (সহনমাত্রার ১৪০০ গুণ) এবং যমুনার জলে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ৩০ হাজার এম.পি.এন (সহনমাত্রার ৬৬০ গুণ) কলিফর্ম উপস্থিত রয়েছে। কোন নমুনাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। এছাড়া বায়োমেডিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (অর্থাৎ নমুনায় উপস্থিত ব্যাকটিরিয়া কী পরিমাণ অক্সিজেন গিলে নিচ্ছে) পরীক্ষাও ভয়ংকর দূষণের প্রমাণ দিয়েছে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উত্তরপ্রদেশ কর্তৃপক্ষকে সমন পাঠায়।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ১৯শে ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সরকারী সংস্থার উক্ত তথ্যপ্রমাণকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন এসবই সনাতন ধর্মকে অপমান করা। সঙ্গমের পবিত্র জল 'স্নান' ও 'আচমন' (জল মুখে নেওয়ার রীতি) এর উপযোগী। সব কিছুই মাত্রার মধ্যে আছে। এমনকি তা পান করার জন্যও নিরাপদ। অর্থাৎ পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক সভায় ব্যাখ্যা নথিভুক্ত করা যায়।

কুম্ভমেলায় 'আই.আই.টি বাবা', 'অ্যামবাসাডর বাবা', 'বিজনেসম্যান বাবা', 'টাচ বাবা', 'প্রিন্স বাবা', 'পাইলট বাবা' – ইত্যাদি অসংখ্য বাবা-মাতাদের ক্ষমতা প্রদর্শন এবং সংবিধানের ৫১এ(এইচ) ধারার [যা বলে প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব হল বিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশ, মানবিকতা ও অনুসন্ধান এবং সংস্কারের প্রতি উৎসাহ] সহাবস্থান নিশ্চিতভাবেই ব্যাখ্যাযোগ্য।

'ব্যাখ্যার অতীত' এবং ব্যাখ্যাযোগ্য রূপে পেশ করা পরিঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে এক সহজ সত্য সামনে উঠে আসে। কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কুম্ভমেলা বা এরকম আরো বহু অনুষ্ঠান নয়, মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের হজযাত্রা সহ খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের বহুবিধ অনুষ্ঠানে-সমাবেশে-কৃচ্ছসাধনে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ সামিল হন। এঁদের বেশিরভাগের কাছে দৈনন্দিন জীবনের দুর্দশা, লাঞ্ছনা, গ্লানির কোন ব্যাখ্যা নেই। না আছে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, মুক্ত হওয়ার আশা। এঁরাই অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে, দলিত হয়ে, প্রতারিত হয়ে, পদপিষ্ট হয়েও যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের ব্যাখ্যাতীত পথে যাত্রা করেন। এটা হল বাস্তবতার একটা দিক। অন্যদিকটা হল রাষ্ট্র এবং তার সংগঠনগুলির ব্যাপক প্রচার, প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা, এলাকায় এলাকায় ঢেউ এর মত হুজুগ তৈরি করা সর্বোপরি বিপুল অর্থ ব্যয় করা ছাড়া এমন ধর্ম অভিযান সফল হয় না। অতএব এধরনের আয়োজন রাষ্ট্রনীতির অংশ।

সামাজিক বিজ্ঞানের নিয়মেই ধর্মসমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের বড় অংশ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। বাগেশ্বর ধামের প্রধান যেমন বলেছেন – মরতে তো হতই, প্রয়াগে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুতে মোক্ষলাভ হয়েছে – এমন অমৃত পথের দিশারীদের স্বরূপ চিনতে শেখেন। সেকারণেই কালক্ষেপ না করে জীবনযুদ্ধে নিজেদের নিয়োজিত করেন।

সেকারণেই রাষ্ট্রশক্তি বাধ্য হয় লাগাতার এমন অভিযান চালিয়ে যেতে – একটার পর একটা। অযোধ্যার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আবেগ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মহাকুম্ভের রেশও অচিরেই মিলিয়ে যাবে।

সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন বিজ্ঞানকর্মীরা ব্যাপক জনসাধারণের অসহায়তার উৎস ও কারণগুলিকে অনুধাবন করেন। 'কুসংস্কারগ্রস্ত' বলে নিন্দাবাদ করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেন না। অসহায়তার উৎসগুলিকে নির্মূল করার সংগ্রামে জনগণের সাথী হয়ে ওঠেন। ■

বিশেষ রচনা ঃ

বুচ-সুনীতাদের প্রত্যাবর্তন এবং ...

অবশেষে ৮ দিনের বদলে ৯ মাস পর ১৯শে মার্চ ভারতীয় সময় ভোর ৩:২৭ মিনিটে পৃথিবীতে ফিরলেন সুনীতারা। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা মহাকাশ গবেষণার কাজে দুজন মার্কিন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরকে মহাকাশে পাঠায়। যা ছিল নাসার স্পেস-এক্স ক্রু-৯ মিশনের অংশ। এই মিশন হল নাসার 'কর্মাশিয়াল ক্রু প্রোগ্রাম' এর অংশ। গন্তব্য ছিল আন্তজার্তিক মহাকাশ কেন্দ্র (International Space Station)। বোয়িং স্টারলাইনার মহাকাশযানে চড়ে স্পেস ষ্টেশনে যাওয়ার সময়ই তার প্রোপালশন সিস্টেমে গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়ে, প্রথমতঃ থ্রাস্টার সমস্যা। এর ফলে অতি উত্তাপের (over heating) সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপ তাপরোধী টেফলন প্রলেপকে বিকৃত করে দেয়। এর সাথে যুক্ত হয় হিলিয়াম লিকেজ ও সফটওয়্যার সিস্টেমের সমস্যা। বলা যেতে পারে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় তারা স্পেস ষ্টেশনে প্রবেশ করে। এরপর নির্দেশ অনুযায়ী ত্রুটিগুলি মেরামত করার উদ্যোগ নেওয়া হয় কিন্তু তা নাসা-কে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই ঐ যাত্রার নির্ধারিত ঘোষিত মেয়াদ মাত্র ৮ দিনের থাকলেও, প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত করা হয়। মহাকাশচারীদের প্রত্যাবর্তন পিছিয়ে দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ বোয়িং স্টারলাইনার যানটিকে মনুষ্যহীন অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় অক্টোবর, ২০২৪-এ। যা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো মরুভূমিতে অবতরণ করে। পরবর্তীতে ঐ মিশনের অংশ হিসাবে আরও দুজন মহাকাশচারীকে স্পেস-এক্স এর ফ্যালকন রকেটে ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ মহাকাশ ষ্টেশনে প্রেরণ করে নাসা। তারা হলেন আমেরিকান মহাকাশচারী নিক ও রাশিয়ান মহাকাশচারী আলেকজান্ডার গরবুনভ। অবশেষে, চারজন মহাকাশচারীকে নিয়ে ১৮ মার্চ ভারতীয় সময় ১০টা ৩৫ নাগাদ প্রত্যাবর্তন যান স্পেস-এক্স এর ড্রাগন ক্যাপসুলকে স্পেস ষ্টেশন থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কক্ষপথ ক্রমশ ছোট করতে করতে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে যখন প্রবেশ করে, তখন ড্রাগনের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৮ হাজার কিলোমিটার। এই সময় বায়ুমন্ডলের সাথে প্রবল ঘর্ষণের ফলে উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় যার ফলে বেশ কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর গতিবেগ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে ও ১৮ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে প্যারাসুট খুলতে শুরু করে। ২৫ ফুট প্রতি সেকেন্ড গতিবেগে প্যারাসুট আলাদা হয়ে যায় ও ফ্লোরিডা নিকটবর্তী উপসাগরে ড্রাগন ক্যাপসুল অবতরণ করে ১৯শে মার্চ ভারতীয় সময় ভোর ৩:২৭ মি.। নাসা'র বিজ্ঞানীরা নিখুঁত গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে সমস্ত সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নাসা মহাকাশচারীদের ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রচার যা-ই হোক না কেন, মহাকাশচারীদের ফিরিয়ে আনতে দেরি হবার কারণ এটাই। এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে মহাকাশে পাঠাতে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা সমাধান করা। এই গবেষণামূলক কাজটি স্বাভাবিকভাবেই মহাকাশেই করতে হবে। প্রায় ১৫০টি ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক গবেষণা যুক্ত রয়েছে এই মিশনের সঙ্গে। সস্তা, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য মহাকাশযান তৈরি, মহাকাশে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও মহাকাশে চাষবাস করা তথা খাদ্যসমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি হল গবেষণার প্রধান বিষয়। এই গবেষণার ফলাফল আগামীতে চন্দ্র ও মঙ্গলে মনুষ্য অভিযানে বিশেষ কাজে লাগবে। যাদের স্পেস ষ্টেশনে পাঠানো হয় তাদের পরিচয় তারা কেবলমাত্র মহাকাশচারী নন, বরং তারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রের বিজ্ঞানী গবেষক। পৃথিবীর ও মহাকাশের জীবনের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। কোন সংকট উপস্থিত হলে তা কিভাবে সমাধান করতে হবে সেই ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণ রয়েছে সকলের। তাছাড়া পৃথিবী থেকে দিনরাত বিজ্ঞানীরা যোগাযোগ রেখে চলেন

মহাকাশচারীদের সঙ্গে। মহাকাশ বিজ্ঞানের বিকাশের কারণেই দুর্ঘটনা ছাড়া শারীরিক অসুস্থতার কারণে মহাকাশে আজ পর্যন্ত কোন মহাকাশচারীর মৃত্যু ঘটেনি। যখনই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সুনীতাদের প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হবে, পরিকল্পনা রাতারাতি বদলে ফেরা হল। দীর্ঘদিন মহাকাশের সল্প অভিকর্ষে থাকলে কি কি শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হয় ও তার প্রতিকার কি – এটাই বিজ্ঞানীদের কাছে হয়ে উঠল অন্যতম প্রধান গবেষণার বিষয়বস্তু। পৃথিবীর অভিকর্ষের বাইরে থাকলে হাড়ের ঘনত্ব হ্রাস পাওয়া, মাংসপেশি, হৃদপিন্ড, ফুসফুস, রক্তচাপ সহ অন্যান্য যেসব শারীরিক পরিবর্তন হয় সেই বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান সঞ্চয় করা ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে উল্লেখযোগ্য গবেষণার বিষয়। যে জ্ঞান আগামীতে চন্দ্র ও মঙ্গলে মনুষ্য অভিযানে বিশেষ কাজে লাগবে। নাসার তরফ থেকে ক্রু-৯-এর কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে জানানো হয়েছে ক্রু-১০ মিশনের কাজ শুরু হয়েছে ও বিজ্ঞানীরা ১৬ মার্চ সাফল্যের সাথে স্পেস ষ্টেশনে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ পরবর্তী গবেষণার কাজ শুরু করেই সুনীতারা রওনা দিয়েছিল পৃথিবীর উদ্দেশ্যে। ফিরে আসার পর ওদের চারজনের মুখের যে হাসি দেখা গেল তা তো সেই সাফল্যেরই হাসি।

নাসা বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে ও মহাকাশচারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছে ও সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে চলেছেন। অথচ সুনীতাদের কেন ফিরিয়ে আনা হয় নি এই আওয়াজ তুলে ট্রাম্প প্রশাসন পূর্ববর্তী বাইডেন সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছে। আবার ফিরে আসার পর কৃতিত্ব নেওয়ার নিকৃষ্টতম প্রতিযোগিতায় মেতেছে। একদিকে বিজ্ঞানীদের নিত্যনতুন উল্লম্ফনকারী গবেষণা মানব সমাজকে উন্নত করার প্রয়াস রেখে চলেছে, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক ফলাফলগুলিকে মানব বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মানব সমাজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে মুনাফার স্বার্থে। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই ট্রাম্প প্রশাসন বিজ্ঞান গবেষণায় বাজেট হ্রাস করে চলেছে, বিজ্ঞানীদের ছাঁটাই করছে ও বিজ্ঞানের বিকাশ রুদ্ধ করার সমস্ত রকম পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। আমেরিকা সহ সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজ এর প্রতিবাদে বিজ্ঞানীরা রাস্তায় নেমেছে। যাদের মধ্যে নাসার বিজ্ঞানীরাও সামিল।■

চয়ন ঃ

শহীদ ভগৎ সিং-এর বিজ্ঞান মনস্কতা

[শহীদ শ্রেষ্ঠ ভগৎ সিং বিজ্ঞান মনস্ক বস্তুবাদী হয়ে উঠেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এমন এক পর্যায়ে যখন তিনি আজকের মতো বিখ্যাত হন নি। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর বিপ্লবীদলের অধিকাংশ নেতৃত্ব যখন ব্রিটিশের জেলে বন্দি। সংগঠনটাই উঠে যাওয়ার পর্যায়ে, তখন পিছনের সারিতে থাকা এই যুবকটি সংগঠনের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নিজেদের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিকে শুধরে ফেলতে সমাজ তথা বস্তুর বিকাশের বিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু করেন। তখনই তিনি পৃথিবীর উৎপত্তি, মানবজাতির উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেই সময়ই এই বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়।]

"এই পৃথিবীর উৎপত্তি, মানবজাতির উৎপত্তি আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করি সে সম্পর্কে কি আপনারা প্রশ্ন করছেন? ঠিক আছে, আমি আপনাদের বলি, চার্লস ডারউইন এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন, তাঁর লেখা পড়ুন। সোহম স্বামীর 'সাধারণ জ্ঞান' পড়ুন। কতক পরিমাণে তাতে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর মিলবে। এ হলো প্রাকৃতিক ঘটনা। বিভিন্ন রকমের নীহারিকাবৎ পদার্থের আকস্মিক সংমিশ্রণের ফলে এ জগতের উদ্ভব হয়েছে। কখন? ইতিহাস পড়ুন। একই প্রক্রিয়ায় জন্ম হয়েছে জীবজন্তুর এবং দীর্ঘদিন পরে মানুষের। ডারউইনের ***Origin of Species*** *পড়ুন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবিরাম দ্বন্দ্ব ও তাকে উত্তরণ করার প্রচেষ্টা থেকেই পরবর্তীকালে সমস্ত রকমের প্রগতি। এ ঘটনার এই হলো সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সম্ভবপর ব্যাখ্যা।"*

(ভগৎ সিং লিখেছেন 'কেন আমি নাস্তিক' গ্রন্থে)

বিশেষ রচনা ঃ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানব সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

– লোহিতার্ক সান্যাল

আপনার বাড়ীর টেলিভিশনটা হঠাৎ বিগড়ে গেল। বাড়ীর সকলে মিলে একটা খুব দরকারী অনুষ্ঠান দেখছিলেন, আর সেই মুহূর্তেই এই বিপত্তি। স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের সবাই ভীষণ অখুশি। আপনারা হয়তো আগেই ভেবেছিলেন যে বাড়ীর টেলিভিশনের মডেলটা বেশ পুরানো হয়ে গেছে, এটা বদলানো দরকার। কিন্তু, আজ কিনব কাল কিনব করে কাজের চাপে কিনে উঠতে পারেননি। এখন আপনি সপরিবারে আলোচনা করে ঠিক করবেন বাজারের হাজারো কোম্পানীর মধ্যে কোন টেলিভিশনটা কিনবেন। নিজের নিজের মোবাইল ফোনের সার্চ ইঞ্জিনে ঢুকে কেউ কেউ টেলিভিশনের ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করলেন। এর কিছুক্ষণ পর থেকে আপনারা না চাওয়া সত্ত্বেও ঐ মোবাইলে বিভিন্ন টেলিভিশন কোম্পানী তাদের পণ্যের বিবরণ জানিয়ে নোটিফিকেশন পাঠাতে শুরু করল। কোন টেলিভিশনে কি সুবিধা আছে, দাম কতো, কোথায় পাওয়া যাবে, হোম ডেলিভারি হবে কিনা, ইএমআই সুবিধা কি ইত্যাদি। আপনার ই-মেলের ইনবক্স ভরে গেল একই রকম নোটিফিকেশনে। কোম্পানীর লোকেরা ফোন করতে শুরু করল অবিরাম। এমন কি, যে মোবাইল ফোনগুলিতে সার্চ করা হয়নি সেগুলিতেও আসতে শুরু করল একই ধরনের নোটিফিকেশন। অর্থাৎ, ঐ ফোনগুলি আপনাদের আলোচনা শুনেছে, টেলিভিশনের চাহিদা বুঝেছে, টেলিভিশন কোম্পানী তা জানতে পেরেছে ও ফোনগুলিতে নোটিফিকেশন পাঠিয়েছে। এই সূত্র ধরে ঋণদানকারী সংস্থাগুলি আপনার প্রয়োজন জেনে যাবে ও আপনাকে ঋণ প্রদান করার জন্য ফোন করবে বা নোটিফিকেশন পাঠাবে।

এই ঘটনাগুলি কি কাকতালীয়?

এমন ধরনের কম-বেশি অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সকলেরই আছে। প্রাথমিক ধারণায় ব্যাপারটা কাকতালীয় বলে মনে হলেও একেবারেই তা নয়। আসলে, আমাদের হাতের সেল ফোনটি আমাদের অজান্তে কখন যে ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে, তা আমরা টের পাইনি। সেটা ক্রমশঃ মেধাবী হয়ে উঠেছে, তাকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে ধাপে ধাপে। যার ফলে যন্ত্রের মেধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তা বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের এরকম কতশত উদাহরণ রয়েছে আমাদের চারপাশে। আজকাল শোনা যাচ্ছে নিত্যব্যবহার্য্য বিভিন্ন যন্ত্র যেমন হাতঘড়ি, টিভি, ক্যামেরা, রেফ্রিজারেটরগুলিও ক্রমশঃ স্মার্ট হয়ে উঠছে। যদিও 'স্মার্ট' যন্ত্র ও বুদ্ধিমান যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। স্মার্ট যন্ত্রে ব্যবহৃত সেন্সারের মাধ্যমে সে পরিবেশকে বুঝতে পারে। পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, আলোর প্রাবল্য, স্পর্শ ইত্যাদির তারতম্য বুঝে সে কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্র হল পুরোপুরি তথ্য-নির্ভর। আগে থেকে পুরে দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত জানানোর ক্ষমতার অধিকারী ঐ যন্ত্রগুলি। কোন যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে এআই নির্ভর হতে পারে। তবে আজকাল ঘরোয়া বহু পণ্যকে আংশিকভাবে এআই নির্ভর করা হচ্ছে। যেমন, রেফ্রিজারেটরে এআই যুক্ত করার ফলে তাতে রাখা সামগ্রীর প্রয়োজন অনুযায়ী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, পচনশীল সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাবার আগে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করা ইত্যাদি। এ সবই হল তথ্য বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগের কারসাজি। চলমান যন্ত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ ক'রে কোন নির্দিষ্ট কাজ আদায় করে নেওয়ার উপায়ও আজ বিজ্ঞানের করায়ত্ত। যন্ত্র বিজ্ঞানের এই শাখাটির প্রচলিত নাম হল রোবটিক্স। গার্হস্থ্য বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য রোবটিক্সের ব্যবহারও এখন হাতের নাগালে এসে গেছে। ঘরের চার দেওয়ালের বাইরের জগতে তাকালেও দেখা যাবে সেই একই ছবি। তথ্যানুসন্ধানে, অফিস-আদালতে, কল-কারখানার উৎপাদনে, যানবাহন নিয়ন্ত্রণে, ব্যাঙ্কিং পরিষেবায়, চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথা রোগ নির্ণয়, শল্যচিকিৎসা, ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ক্ষেত্রে, চালকবিহীন গাড়ী – বলতে গেলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বুদ্ধি পাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্সের ব্যবহার। এতটাই দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে অতীতের সাবেকি উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নির্ভর পণ্যের ঢল নেমেছে। পুরানো 'আনস্মার্ট' পণ্যগুলির উৎপাদন বন্ধ করে সেই জায়গায় 'স্মার্ট' যন্ত্রের উৎপাদন করে নিত্যনতুন বাজার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরশীলতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যে তাকে ব্যতিরেকে মানুষের জীবন ধারণ ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আর হবে নাই বা কেন? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিকাশের ফলে পরিশ্রমসাধ্য কঠিন কাজ চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই হাসিল করা সম্ভব হচ্ছে। সময় ও শ্রম সাশ্রয় করার পাশাপাশি যন্ত্র সম্পাদিত কাজ হয়েছে আরও নিখুঁত, আরও উৎকর্ষ, আরও ত্রুটিমুক্ত। কায়িক হোক বা বৌদ্ধিক, কাজের চরিত্র যাই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক শ্রমলাঘব ঘটছে। এ যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে এসে গেছে। কঠিন সব গাণিতিক হিসাব হয়ে যাচ্ছে চোখের পলকে। কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে সেল ফোনে কয়েকটি শব্দ-সূত্র টাইপ করলে বা মুখে উচ্চারণ করলেই কয়েক মুহূর্তে ফোনের পর্দায় ভেসে উঠছে যা আপনি জানতে চান। অফিসে যাবেন বা কোথাও বেড়াতে যাবেন? ঘরে বসে টিকিট কেটে নিন তারপর জেনে নিন আপনার ট্রেন বা গাড়ী কোথায় রয়েছে। আপনার ফোনকে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার তাপমাত্রা কত থাকবে, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কতটা। একমুহূর্তে জেনে যাবেন যা জানতে চান সবকিছু। সেই মতো নিজেকে তৈরী করে নিয়ে আপনি বেরিয়ে পড়বেন। রাস্তায় বেরিয়ে পথ হারিয়েছেন? সেল ফোনে ম্যাপ দেখে নিন আর তার নির্দেশ মতো পৌঁছে যান আপনার গন্তব্যে। এইভাবে সর্বদা সাহায্যকারী বন্ধুর মতো জীবনের চলার পথের প্রতিটি পদে আমাদের সাহায্য করে চলেছে মেধাবী যন্ত্রগুলি। পাশাপাশি, আরেকটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এই সাহায্যকারী যন্ত্রগুলি কতটা বিশ্বস্ত?

তথ্য ধর্ম তথ্য কর্ম তথ্যহি পরমং তপঃ

যন্ত্রের মেধাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে প্রতারণা করার ঘটনা ঘটে চলেছে অহরহ। নিত্য নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে মানুষকে প্রতারিত করা হচ্ছে, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, সর্বশান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। যন্ত্রে ব্যবহৃত কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক-এর বিকাশের পথ ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমানে মেশিন লার্নিং থেকে বিকশিত হয়ে ডিপ লার্নিং যুগ অতিক্রম করে জেনারেটিভ লার্নিং যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের (মৃত বা জীবিত) মুখাবয়ব, গলার স্বর হুবহু নকল করা সম্ভব হয়েছে। খুলে গেছে প্রতারণার নানান দিক। প্রযুক্তির বিকাশের দৌলতে মেধাবী যন্ত্র ব্যবহারকারীদের নানান ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আপনি কোথায় কাজ করেন, আপনার রোজগার কত, আয়কর দেন কিনা, দিলে তা কত, নিজস্ব গাড়ী-বাড়ি আছে কিনা, ঋণ নেন কিনা, ঋণ নিলে সঠিক সময়ে পরিশোধ করেছেন কিনা, আপনি কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন, এমন কি আপনার সেল ফোনে সংরক্ষিত বন্ধুবান্ধবদের নাম ধাম ফোন নম্বর ইত্যাদি সব কোন কিছুই ডিজিটাল মাধ্যমে গোপন নয়। কারণ, প্রতিটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ফোন নম্বর সবই একই সূত্রে সংযুক্ত করা আছে। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রে যার গাল ভরা নাম হল কেওয়াইসি (Know Your Customer), অর্থাৎ আপনার গ্রাহক কে জানুন। এই সংযুক্তিকরণ না করলে সমস্ত পরিষেবা থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কেওয়াইসি নবীকরণ না করলেও পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর সেই সুযোগেই চুরি হয়ে যাচ্ছে মানুষের সমস্ত তথ্য। তথ্য চুরির এক জনপ্রিয় পদ্ধতি হল হ্যাকিং। এই পদ্ধতিতে যন্ত্রের নিরাপত্তা বলয়কে ভেদ করে যন্ত্রে সংরক্ষিত তথ্যভান্ডার অ্যাক্সেস করা সম্ভব, চাইলে চুরিও করা যায়। আবার, অলক্ষ্যে যন্ত্রের দখল নিয়ে নেওয়া যায়। তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ অনুযায়ী হ্যাকিং বেআইনী। তবে সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে হ্যাকিং করলে তা নৈতিক। হ্যাকিং বিষয়টিও কম্প্যুটার বিজ্ঞানের অন্তর্গত। প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে যন্ত্রের নিরাপত্তা বলয়ের বিকাশ ঘটছে। আবার তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হ্যাকিং-এর নিত্যনতুন ফন্দি। বৃদ্ধি পেয়েছে নজরদারী, বেড়েছে জালিয়াতি, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ডিজিটাল মাধ্যমের অপরাধ প্রতিহত করতে সরকারী সাইবার দমন শাখাতেও পেশাদার হ্যাকারের প্রয়োজন। অধিকাংশ জালিয়াতির কোন কূল-কিনারা না পেয়ে সাধারণ মানুষকে সাবধান থাকার সহজ নিদান দেওয়া হয়। বহুক্ষেত্রে, অফিসের কোন কাজে বা দোকানে পণ্য সামগ্রী কেনার সময় জেনে অথবা না জেনে ক্রেতা সাধারণ নিজেদের তথ্য নিজেরাই সরবরাহ করে থাকেন। আগে যে তথ্যগুলি মানুষের কাছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সশরীরে হাজির হয়ে কর্মীদের ক্ষেত্র-সমীক্ষা থেকে তুলে আনতে হত, প্রয়োজন হত বিশাল কায়িক শ্রমের, বর্তমানে তা অনায়াসেই তুলে আনা যায়। আপনার আমার অজান্তেই ব্যক্তিগত তথ্যগুলি এক তথ্য-প্রযুক্তি কোম্পানী থেকে আরেক কোম্পানীর কাছে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যে তথ্য-প্রযুক্তি কোম্পানীর কাছে তথ্যভান্ডারের আয়তন যত বেশি তার নাম-ডাক ও মুনাফা তত বেশি। তথ্য ব্যবসার সূত্র ধরেই বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে বৃদ্ধি পেয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি কোম্পানীগুলির রমরমা। বর্তমানে কেবলমাত্র ভারতে রয়েছে এক লক্ষ পঁচাশি হাজারের বেশি তথ্য-প্রযুক্তি কোম্পানী। এর মধ্যে ৭১ শতাংশ পরিষেবা

ক্ষেত্রে, ২৩ শতাংশ শিল্প ক্ষেত্রে ও ৬ শতাংশ রয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে। যার মোট পরিশোধিত মুলধন প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা। (ইকনমিক টাইমস্)

যন্ত্র কিভাবে 'বুদ্ধিমান' হল?

যন্ত্রের ক্রমশঃ বুদ্ধিমান হয়ে যাওয়াটা ঘটেছে মানুষের হাত ধরে এক দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে। মানব সভ্যতার আদিতে মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর মতই ছিল প্রকৃতি নির্ভর। মানবসমাজের প্রকৃত বিকাশ তখনই শুরু হয়েছিল যখন মানুষ জীবন ধারণের জন্য শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে স্বকীয় শ্রম ও বৌদ্ধিক শক্তির ব্যবহার করেছিল। পশু, পাখি ও মাছ শিকার করার জন্য হাতিয়ার নির্মাণ, কৃষি কাজের যন্ত্রপাতি নির্মাণ, পোশাকের জন্য গাছের বাকল থেকে সুতো তৈরী, পাথর কেটে পাথর খন্ড দিয়ে গৃহ নির্মাণের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রযুক্তিগত বিকাশের সূত্রপাত হয়েছিল। পরিশ্রম লাঘব করতে প্রথমে কাঠ, পাথর ও পরবর্তীতে ধাতু দ্বারা নির্মিত মূলতঃ লিভার, চাকা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। সেই সময় যন্ত্রে মনুষ্যশ্রম ও পশুশ্রম ছিল সামাজিক উৎপাদনের একমাত্র অবলম্বন। পরবর্তীকালে প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের বিকাশ হতে থাকল। বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ক্রমশঃ উৎকর্ষতা লাভ করল। সমাজ বিকাশের সাথে সাথে জীবন ধারণের জন্য আবশ্যিক নিত্যনতুন সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকল। যন্ত্রের গঠন, আকার ও ক্রিয়াকৌশল ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হলেও বিজ্ঞানের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যন্ত্রের যান্ত্রিক সুবিধা ও উৎপাদনশীলতা উভয়ই বৃদ্ধি পেতে থাকল গুণোত্তর প্রগতিতে। মানুষের পেশীশক্তির পাশাপাশি বায়ুশক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি ও তাপশক্তির ব্যবহার যন্ত্র চালনাকে আরও সহজ করে তুলল যা সমাজের চেহারায় দ্রুত পরিবর্তন এনে দিল। যন্ত্র স্থাপন করে কল-কারখানায় শুরু হল শিল্প উৎপাদন। এই শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সামাজিক উৎপাদন বিকশিত হয়ে জন্ম দিল এক নতুন অধ্যায়ের, এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। যা আজও বিরাজ করছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। এই ব্যবস্থার শিখরে বসে আছে উৎপাদিত সমস্ত সামাজিক সম্পদ ও যন্ত্র সহ উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উকরণের কতিপয় মালিকগোষ্ঠী আর তার নীচে রয়েছে আপামর সাধারণ মানুষ যাদের শ্রমেই সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত সামাজিক সম্পদ। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হল মুনাফা সৃষ্টি করা। মুনাফার পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে যাওয়াই হল এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার একমাত্র চাবিকাঠি। এর জন্য প্রয়োজন হল কাঁচামালের উপর দখলদারি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আর সস্তা শ্রমশক্তি। শ্রমশক্তি যত সস্তা হবে মুনাফার পরিমাণ তত বেশি। তার জন্য প্রয়োজন যন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা ও ন্যূনতম মনুষ্যশ্রম ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মুনাফা সৃষ্টি করা। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে এসে সমাজের পরিচালকেরা এখন আরও বুদ্ধিমান, আরও সচেতন। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রে যন্ত্রের সাথে শ্রমদানকারী মানুষের আরও বেশি করে বিচ্ছিন্নতা ঘটানোর উদ্যোগ শুরু হল। মানুষের বিকল্প চাই, এমন বিকল্প বানাতে হবে যা মানুষের মতো কাজ করবে, মানুষের মতো চিন্তা করবে, বিরামহীনভাবে কাজ করে যাবে। নিয়োগকর্তার কাছে থাকবে না কোন দাবি, কোন প্রত্যাশা।

কিন্তু ব্যাপারটা কি এতোটাই সহজ? এতো কল্পবিজ্ঞান। আবার এটাও সত্যি যে মানুষের কৌতুহল, তার উদ্ভাবনী শক্তিই তো যুগে যুগে কল্পবিজ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। সালটা ছিল ১৯৫৬, আমেরিকার ডর্টমুথ বিশ্ববিদ্যালয়, সামার রিসার্চ প্রজেক্ট ওয়ার্কশপ। বিষয় – কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ২৭ জন বিজ্ঞানী জড়ো হয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সাত দিনের কর্মশালা শেষ হল তিন সপ্তাহ পর। আলোচনা হল এমন যন্ত্র বানানো কি সম্ভব যার সাথে মানুষ কথোপকথন করতে পারবে? কিছু প্রশ্ন করলে যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে পারবে? সমস্যা হল, কম্প্যুটারকে (সাধারণভাবে যন্ত্রকে) কিভাবে মানুষের ভাষা বোঝানো যাবে? তৈরী হল যন্ত্রের বোধগম্য হরেক রকম ভাষা – কম্প্যুটার ল্যাঙ্গুয়েজ। প্রথমদিকে কম্প্যুটারকে 'হ্যাঁ' অথবা 'না'-তে উত্তর দিতে শেখানো হল। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অ্যালগোরিদম ও প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে শেখানো হল কোন প্রশ্ন করলে কি উত্তর দিতে হবে। যন্ত্রের ভাষার বিকাশের ফলে মানুষের সাথে যন্ত্রের ব্যবধান সামান্য হ্রাস পেতে থাকল ঠিকই, অধিকাংশক্ষেত্রেই উত্তর এল এলোমেলো, যুক্তিগ্রাহ্যহীন। কিন্তু বিজ্ঞান তো থেমে থাকে না। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, যন্ত্রকে বুদ্ধিমান বানাতে গেলে তার ভিতরে অনেক তথ্য থাকা দরকার। তবে, যন্ত্রকে তথ্য দিয়ে ঠাসা 'বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই' বানিয়ে তো লাভ নেই। মানুষের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করলেন বিজ্ঞানীরা। একটি শিশুকে পরিবেশ চেনাতে গেলে যেমন বিভিন্ন বস্তু মন্ডলীর সংস্পর্শে নিয়ে এসে তার সাথে পরিচয় ঘটানো হয়। এইভাবেই শিশুর বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মস্তিষ্কে তথ্যভান্ডারের আয়তনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষের মস্তিষ্ক সেই তথ্যকে বিশ্লেষণ করে যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দিতে পারে, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত জানাতে পারে। কিন্তু যন্ত্র তা পারবে কিভাবে? তাই যন্ত্রকে দিতে হবে তথ্য

বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। তাহলেই যন্ত্র দিতে পারবে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। শুরু হল তথ্য বিশ্লেষণ বা ডেটা অ্যানালিসিস-এর মাধ্যমে যন্ত্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই উপসেটটিকে বলা হয় মেশিন লার্নিং। মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুতন্ত্রের একক হল নিউরন। এর কার্যপ্রণালীর উপর মনোনিবেশ করে তার অনুকরণ করার প্রয়াস বিজ্ঞানীরা শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে। সেই সময়ে বিজ্ঞানীরা গাণিতিক পদ্ধতির বাইরে বেরোতে পারেননি। পরবর্তীকালে, স্নায়ুবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের জ্ঞান মিলিত হয়ে জন্ম নিল কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের ধারণা। যন্ত্রকে প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে। যদিও মানব মস্তিষ্কের নিউরনের ও কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের গঠন ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। মানুষের কথা বলা, চলাফেরা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রশ্নের উত্তরে মিশে থাকে তার কল্পনা, যুক্তি, রসবোধ, আবেগ, সংবেদনশীলতা, পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি। অন্যদিকে, যন্ত্রে এর সবকিছুই অনুপস্থিত। কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক প্যাটার্ন ম্যাচিং-এর মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রথমে একস্তরীয় ও পরবর্তীকালে বহুস্তরীয় কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার ফলে প্যাটার্ন ম্যাচিং-এর সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। ফলস্বরূপ, একটি প্রশ্নের হাজার হাজার সম্ভাব্য উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা যন্ত্র অর্জন করে ফেলল। **ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব** আবিষ্কারের পর সারা বিশ্বের নেটওয়ার্ক যুক্ত করে দেওয়া হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এর ফলে তথ্যের অভাব আর রইল না। এই সুবিশাল তথ্যভান্ডারের আয়তন ও তার বৃদ্ধির হার এক কথায় অকল্পনীয়। আজকালকার সাধারণ সেল ফোনে ইন্টারনেট সার্চের গড় প্রতিক্রিয়া সময় ১ থেকে ১০ মিলিসেকেন্ড (১ সেকেন্ড = ১০০০ মিলিসেকেন্ড)। অর্থাৎ যন্ত্রকে নির্দেশ দেওয়া (ইন পুট) ও কাজ সমাধা হওয়ার (আউট পুট) মধ্যে সময়ের গড় ব্যবধান হল ১ থেকে ১০ মিলিসেকেন্ড। এই সময়ের মধ্যেই ব্যবহারকারীর যন্ত্র থেকে নির্দেশ প্রেরিত হয়ে চলে যায় সাইবার দুনিয়ায়। সেখানে তথ্য প্রসেসিং হয়ে ফিরে আসে ব্যবহারকারীর যন্ত্রে। এর তুলনায় মানুষের মস্তিষ্কের গড় প্রতিক্রিয়া সময় প্রায় ১০০ গুণ বেশি অর্থাৎ যন্ত্রের তুলনায় মানুষের মস্তিষ্ক প্রায় ১০০ গুণ মন্থর। ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যেকার এই অতিক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে অদৃশ্য সাইবার দুনিয়ায় অন্যূন পাঁচটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রান্ত হয়। সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে এটা একটা রহস্যময় অন্ধকার জগৎ।

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই তথ্যভান্ডারের আয়তন হতে চলেছে ১৭৫ জিটাবাইট। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ ছিল ৩৩ জিটাবাইট। (১ জিটাবাইট = $১০^৯$ গিগাবাইট) (সূত্র – আইডিসি) এখানেই শেষ নয়। প্রতি বছর এর আয়তন ২২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হচ্ছে (সূত্র – সিসকো)। গুগুল-এ প্রতিদিন ৫০০ কোটি তথ্যানুসন্ধান হয়, টুইটারে প্রতিদিন ৫০ কোটি টুইট করা হয়, প্রতিদিন ৪৩ লক্ষ ফেসবুক মেসেজ করা হয়, ইউটিউবে প্রতিমিনিটে ৫০০ ঘন্টা ভিডিও আপলোড হয়। (সূত্র – ইন্টারনেট লাইভ স্ট্যাট, ইউটিউব)। সারা বিশ্বে প্রায় ৫০০ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, ৬৩০ কোটি স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারী অবিরত নিজের অজান্তে এই তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তাদের মধ্যে আপনিও একজন। বিজ্ঞানের এই অনন্য আবিষ্কার পৃথিবীবাসীকে বিশ্ব-জোড়া ফাঁদে বন্দী করেছে।

এই তথ্যভান্ডার কার দখলে?

আজকাল একটা শব্দ খুব শোনা যায় – GAFAM, এটা কোন অর্থপূর্ণ শব্দ নয়। এটা বর্তমানের পাঁচটি অতিবৃহৎ কোম্পানীর নামের আদ্যক্ষর। [গুগুল, আমাজন, ফেসবুক (বর্তমানে মেটা), অ্যাপেল ও মাইক্রোসফট]। প্রতি মুহূর্তে যে তথ্য তৈরী হচ্ছে তা গিয়ে জমা হচ্ছে এই অতিদানব কোম্পানীগুলির ভান্ডারে। এই কোম্পানীগুলি বর্তমানে বিশ্বঅর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্প্যুটিং, ই-কমার্স, অনলাইন বিজ্ঞাপন, সমাজ মাধ্যম, সফটওয়ার ডেভলপমেন্ট এই সমস্ত ক্ষেত্রেই এরাই আধিপত্য বিস্তার করে আছে। অর্থাৎ, ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি সমাজ মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী রয়েছে এদেরই হাতে। পিরামিডের শিখরে বসে এরাই পুরো পিরামিডের উপর শ্যেনদৃষ্টি রেখে চলেছে। তাদের তৈরী করা সমাজমাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সৃষ্ট ডিজিটাল সমাজমাধ্যম দূরকে করেছে নিকট, ভেঙ্গে দিয়েছে ভৌগোলিক সীমারেখা, গড়ে উঠেছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। মানুষের সৃষ্টিশীলতা, মননশীলতা, ভালোলাগা, ভালোবাসা প্রকাশ করার ও বিনোদনের এ এক অনন্য মাধ্যম। পাশাপাশি এই ব্যবস্থার ও সমাজ পরিচালকদের প্রতি রাগ, ক্ষোভ, চাহিদা, দ্রোহ আছড়ে পড়ে এই মাধ্যমে। প্রভুরা কিন্তু সজাগ। যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে মুছে দেওয়া হয় আপত্তিকর শব্দ, আপত্তিকর কথোপকথন যা প্রভুদের বিব্রত করে। সাবধান করা হয়, নজরদারী চালানো হয় প্রয়োজনে সমাজ মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তাদের যারা সমাজ পরিচালকদের অস্বস্তি ও বিপদের কারণ।

তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে 'বুদ্ধিমান' যন্ত্রগুলি কি পক্ষপাতহীন?

প্রশ্নটা একটু অদ্ভুত ধরনের। সাধারণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা একটু বোকা বোকা। কারণ চালক যেভাবে চালাবে যন্ত্র সেইভাবেই চলবে। কিন্তু যে যন্ত্রকে প্রশিক্ষণের দ্বারা ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান বানানো হচ্ছে সে তো প্রশিক্ষক তথা প্রভুর দর্শন অনুযায়ী কাজ করবে। যেমন স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচী সেই ভাবেই সাজানো হয় যা সমাজ পরিচালকদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়া হয় যা বিজ্ঞানের দর্শন আত্মস্থ করার জন্য তথা বিজ্ঞানমনস্ক মন তৈরী করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি সকল বিষয়ের পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রে একই পথ অনুসরণ করা হয় যা বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার অন্তরায়। প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ সমাজকে প্রগতির পথে চালিত করে, এটাই বর্তমান শাসকদের ভয়ের কারণ। যন্ত্রকে প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবে প্রযুক্ত হয় একই নীতির।

এতদসত্ত্বেও কোন সমাজ সচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ যন্ত্রের উপযোগীতাকে অস্বীকার করতে পারে না। সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্তরে 'বুদ্ধিমান' যন্ত্রের উপর নির্ভরতা একে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। এই সমস্ত কারণেই বর্তমান যুগকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও প্রয়োগের যুগ বলা হয়। এর ভালো মন্দ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে এই বিষয় নিয়ে চলছে তর্কবিতর্ক, চলছে নিরন্তর আলাপ আলোচনা। এর মধ্য থেকে উঠে আসে মূলতঃ দুটি দিক। একদিকে যেমন রয়েছে বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় আবিষ্কারের মুগ্ধতা ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের চমৎকারিত্ব আর অন্যদিকে রয়েছে মানুষের সৃষ্টিশীলতার সংকট, সামাজিক অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা, আতঙ্কগ্রস্ততা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবিষ্কার ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ফলে কল-কারখানা-অফিস-আদালতে কর্মরতরা কর্মচ্যুত হচ্ছেন বা কর্মচ্যুত হবার আশঙ্কায় ভুগছেন, আবার স্কুল-কলেজের পড়ুয়া ও বেকার যুব সমাজকে কর্মসংস্থানের চরম অসম্ভাবনায় বিষাদগ্রস্ত করে তুলছে। সমাজে এমন পরিস্থিতি যে এই নতুন সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়। শিল্প-বিপ্লবের সূচনা কাল থেকে ছোট বড় উৎপাদন ক্ষেত্রে যন্ত্র তথা প্রযুক্তির ব্যবহার বারে বারে এমন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে।

তাহলে, যন্ত্র কি যন্ত্রণার নামান্তর?

শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরের কলকারখানায় শুরু হয় এক অভূতপূর্ব শ্রমিক আন্দোলন। সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে শিল্পক্ষেত্রে নিত্যনতুন যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার দলে দলে শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করতে থাকে যা শ্রমিকদের জীবনধারণে চরম দুরবস্থার জন্ম দেয়। নটিংহামশায়ার, ডার্বিশায়ার, ইয়র্কশায়ার-এর টেক্সাইল শ্রমিকদের একটা বড় অংশ তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য কারখানার যন্ত্রগুলিই দায়ী এমন ধারণা পোষণ করতেন। তারা মনে করতেন যন্ত্রপাতিগুলি ধ্বংসের মাধ্যমে জীবনের সমস্ত শোষণ নিপীড়নের অবসান ঘটবে। শ্রমিকরা সংঘটিত হয়ে কারখানায় কারখানায় যন্ত্রপাতি ধ্বংস করার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ১৮১১ থেকে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, ইতিহাসের পাতায় যা **লুডাইট** আন্দোলন নামে বর্ণিত হয়ে আছে। যন্ত্রগুলো শোষণের কারণ নয় এটা উপলব্ধি করে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সেই পথ পরিহার করে। পরবর্তীকালে সমাজ বিজ্ঞানীরা সামাজিক শোষণের বস্তুনিষ্ঠ কারণ আবিষ্কার করেন। শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বিদ্যমান মুনাফাভিত্তিক সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি কি তা তাঁরা ব্যাখ্যা করেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ম্যাকিনসে রিপোর্টে বলা হয়েছে যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সারা বিশ্বে প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে কর্মচ্যুত করবে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের একটি রিপোর্টে নীতি আয়োগ জানিয়েছে ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে ৬৯% চাকরী গভীর আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। ভারতে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৪০ থেকে ৬০% চাকরীতে এআই অটোমেশন হতে চলেছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে সর্বাধিক কর্মচ্যুতি হতে চলেছে তার মধ্যে রয়েছে – কারখানায় উৎপাদন ও অ্যাসেম্বলী লাইনের কাজ, কাস্টমার সার্ভিস ও টেলিমার্কেটিং, ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং, হিসাব রক্ষণ, যোগাযোগ ও লজিস্টিক ইত্যাদি। অন্যদিকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে কাজের নতুন সুযোগ ঘটবে তা হল – এআই ও মেশিন লার্নিং, তথ্য বিজ্ঞান ও অ্যানালিটিকস, সাইবার নিরাপত্তা ক্ষেত্র, ডিজিটাল মার্কেটিং ও ই-কমার্স, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা সরকারী ও বেসরকারী এ বিষয়ে তাদের অনুমানিক হিসাব নিকাশ ও পরিসংখ্যান দিয়ে চলেছে। সংখ্যার বিচারে হিসাবের তারতম্য উনিশ-বিশ থাকলেও কাজ চলে যাওয়া ও কাজ পাওয়ার মধ্যে বিয়োগফল যে বিশাল তা পরিষ্কার। ২০২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্টেল ১৫ হাজার, টেসলা ২০ হাজার, সিসকো ১০ হাজার, আজামন ১৪ হাজার, বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে ৭.৫ লক্ষাধিক কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে। তালিকা ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

➔

বিজ্ঞানের খবর

নভেম্বর, ২০২৪ ঃ

১৪●সেক্সপীয়ার না চ্যাট জিপিটি? কার সাহিত্য সৃষ্টি মানুষের বেশি পছন্দ? এটা বোঝার জন্য পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের একদল বিজ্ঞানী কবিতার ব্যাপারে অবিশেষজ্ঞ ১৬৩৪ জন মানুষকে নিয়ে একটি গবেষণা করেন। তাদের কোন কিছু না জানিয়ে সেক্সপীয়ার সহ ৫ জন বিশিষ্ট কবির কবিতা ও চ্যাট জিপিটিতে লেখা ৫টি কবিতা এলোমেলো পাঠ করানো হয়। তারপর মতামত চাওয়া হলে তাদের প্রায় সকলেই মানুষের লেখা ও চ্যাট জিপিটি'র লেখার মধ্যে পৃথকীকরণ করতে পারেননি। চ্যাট জিপিটির লেখা কবিতাকে মানুষের লেখা মনে করেছেন ও বেশি পছন্দ করেছেন। এর কারণ হিসাবে গবেষকরা জানিয়েছেন চ্যাট জিপিটির কবিতা তাদের কাছে সরল ও সহজবোধ্য মনে হয়েছে কারণ সেক্সপীয়ার ও অন্যান্য কবির সাহিত্যগুণ তাঁরা বুঝতে পারেননি। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে স্বপ্রশিক্ষিত যন্ত্রমেধা কি মৌলিক সাহিত্যগুণ সৃষ্টি করতে পারে? (নেচার)

১৫●বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে যে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সারা বিশ্বে হাম এর মোট সংক্রমণ ঘটেছে প্রায় ১.০৩ কোটি। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় যা ২০% বেশি। ৫৭টি দেশে এর প্রাদুর্ভাব ছিল সবচেয়ে বেশি, যার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন প্রতিষেধক কর্মসূচীর গাফিলতিই এর কারণ। (হু)

১৮●মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাপ বিদ্যুৎগুলিতে কয়লার দহনের ফলে যে ছাই তৈরী হয় তাতে প্রায় ১১০ লক্ষ টন বিরল-মৃত্তিকা মৌল আছে বলে ঐ দেশের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে প্রতি বছর প্রায় ৮০০ লক্ষ টন কয়লার ছাই জমা হচ্ছে যাতে রয়েছে স্ক্যান্ডিয়াম, নিওডিবিয়াম, ইট্রিয়াম এর মতো বিরল-মৃত্তিকা মৌল। ঐ গুরুত্বপূর্ণ মৌলগুলি একমাত্র পৃথিবীর কোর অঞ্চলেই পাওয়া যায় ও বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন, সোলার প্যানেল, বায়ু চালিত টারবাইন সহ বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয়। এই বিশাল পরিমাণ মৌলকে নিষ্কাশিত করাটাই এখন বিজ্ঞানীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।(সিএনএন)

২০●একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় ২০০ রকমের কোষ থাকে। যার সংখ্যা গড়ে প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন বা ৩৭ লক্ষ কোটি কোষ আছে। মাতৃ গর্ভে মাত্র দুটি কোষ নিষিক্ত হওয়া থেকে শুরু করে পূর্ণ বয়স পর্যন্ত কোষগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হয় ও বিভিন্নতা অর্জন করে তা বিজ্ঞানীদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। গবেষণার এই বিষয়টির নাম 'মানব কোষ মানচিত্র' নির্মাণ। বর্তমানে বিশ্বের ১০০টি দেশে প্রায় ৩৬০০ বিজ্ঞানী এই গবেষণায় লিপ্ত আছেন। গবেষকেরা সারা বিশ্বের প্রায় দশ হাজার মানুষের শরীরের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। আপাতত মানব শরীরের ১০ কোটি কোষের উপর গবেষণা চালিয়ে ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে রয়েছে রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ, ভ্রূণের বিকাশ ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এই গবেষণা মানব শরীরকে আরও

➔

● *কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানব সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?*

মাইক্রোসফট প্রধান বিল গেটস বলেছেন, 'এআই এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে কর্মক্ষেত্রে সপ্তাহে তিন-কর্মদিন এখন আর অসম্ভব নয়। অবসরের সময় বৃদ্ধি পাবে। কাজ, পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবন সমতা আসবে, জীবন হবে স্বাচ্ছন্দ্যময়। জীবনের অর্থ শুধু চাকরি করা নয়' (ইন্ডিয়া টুডে, ১১/০৪/২৪)। সার সত্য কথা বলেছেন বিল গেটস। বিজ্ঞানের কাজই তো অর্থবহ জীবন দান করা। কিন্তু এই মাইক্রোসফট কোম্পানীই আবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ১০ হাজার ও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ২ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে। আগামীদিনে আরও করবে। করতেই হবে। ইনফোসিস কর্তা আবার ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি সপ্তাহে ৭০ ঘন্টা কাজের ফতোয়া জারী করেছে। আসলে, মুনাফা কামানো ও সমাজের সমস্ত মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনদান দুটো সমান্তরাল পথ। যা জোর করে কখনই মেলানো যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না। বর্তমান মুনাফাভিত্তিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এমন ব্যবস্থার পত্তন হবে যেখানে উৎপাদন হবে শুধু মানুষের কথা ভেবে, যেখানে মানুষের জীবন হবে প্রকৃত অর্থে স্বাচ্ছন্দ্যময়। সেই সমাজের আগমন বার্তা আজ সর্বত্র প্রতীয়মান, যে সমাজের সমস্ত মানুষ বিজ্ঞানের সুফলগুলি ভোগ করার অধিকার অর্জন করবে। মানুষের সৃষ্টিশীলতা সমাজকে পৌঁছে দেবে অগ্রগতির সর্বোচ্চ উচ্চতায়। সমাজ বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দেখিয়ে দেয় যে সমাজ সেই অভিমুখেই এগিয়ে চলেছে। ■

বিশদভাবে জানার ব্যাপারে এক উত্তরণ ঘটতে চলেছে। (বিবিসি)

২১.●আকাশ গঙ্গা ছায়াপথের বাইরে লার্জ ম্যাগেলিয়ান ক্লাউডে অবস্থিত একটি অতি দৈত্যাকার নক্ষত্রের (WOH G64) সুস্পষ্ট ছবি প্রকাশ করেছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। ইউরোপীয়ান সাদার্ন অবজারভেটরির অতি শক্তিশালী দূরবীণ ব্যবহার করে জানা গেছে পৃথিবীর থেকে প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রটির ব্যাস সূর্যের ব্যাসের প্রায় ২০ হাজার গুণ। গ্যাস ও ধূলিকণা দ্বারা গঠিত রেশম গুটির ন্যায় আবরণের ভিতরে থাকা নক্ষত্রটির সুস্পষ্ট ছবি আগে কখনো বিজ্ঞানীরা সামনে আনতে পারেননি। (দ্য গার্ডিয়ান)

ডিসেম্বর ঃ

৫●সভ্যতার বিকাশের সূত্র ধরে মানুষ নিজের প্রয়োজনে বিভিন্ন পশুকে পোষ মানিয়েছে। গৃহপালিত পশু ও মানুষের সহাবস্থানের ফরে মানুষ বারে বারে জীবাণুঘটিত সংক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। পশুর দেহে বসবাসকারী অণুজীব যেমন ভাইরাস সাধারণত সরাসরি মানব শরীরে আক্রমণ করতে পারে না। এর জন্য অণুজীবের নিজের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় যাকে জিনতত্ত্বের ভাষায় বলা হয় মিউটেশন। ইদানীং বার্ড ফ্লু ভাইরাস নিয়ে গবেষণায় জানা গেছে একটি মাত্র মিউটেশনের মাধ্যমেই ঐ ভাইরাস মানব দেহে সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম। পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল তিনটি মিউটেশনের দ্বারা বার্ড ফ্লু ভাইরাস এই ক্ষমতা অর্জন করে। এই গবেষণা বিজ্ঞানীদের কাছে অণুজীববিদ্যার নতুন দিক উন্মোচন করেছে। (EL PAIS)

৭●মার্কিন সংস্থা 'ইন্সটিটিউট অব হেলথ ম্যাট্রিক্স এন্ড ইভ্যালুয়েশন' সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানাচ্ছে ১৯৯০ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকায় মৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষে ২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৫ হয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে হৃদরোগ, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস-এর প্রকোপ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ক্ষতিকারক ড্রাগের যথেচ্ছ ব্যবহার দ্রুত বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে এখনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, ঐ সমীক্ষাতেই ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে, এই ধারা বজায় থাকলে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই সংখ্যা ২৬.৭ তে পৌঁছাবে। (সায়েন্স ডেইলি)

১৩● ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধির জন্য কোষমধ্যস্থ মাইটোকন্ড্রিয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আগেই অবগত ছিলেন। জানা ছিল 'কোষের শক্তিঘর' মাইটোকন্ড্রিয়াকে কিভাবে নিষ্ক্রিয় করা হবে সেটাই বিজ্ঞানীদের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। এতদিন বিভিন্ন রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক চার্জ ও জিন থেরাপির প্রয়োগ ছিল বিজ্ঞানীদের প্রধান অস্ত্র। সম্পতি ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির এক গবেষক দল ইঁদুরের কোষে লেজার রশ্মি প্রয়োগ করে মাইট্রোকন্ড্রিয়ার মেমব্রেন ধ্বংস করা তা নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এই পদ্ধতির প্রয়োগ আগামীদিনে ক্যান্সারকে প্রতিহত করতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে চলেছে। (ওহিও স্টেট বিশ্বদ্যিালয়)

১৭●মহাকাশ গবেষণার জন্য জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ-কে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে প্রায় তিন বছর আগে। তার চোখ দিয়ে মানুষ মহাকাশের ইতিবৃত্ত জানতে পারছে। সম্প্রতি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে দূরবর্তী এক উজ্জ্বল সর্পিল ছায়াপথ ধরা পড়েছে। বিজ্ঞানীরা তার নাম রেখেছেন, 'জ্বলন্ত ড্রাগন'। সেই ছায়াপথের ছবি প্রকাশ করে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, 'জ্বলন্ত ড্রাগন'-টি দেখতে আমাদের আকাশ গঙ্গার মতোই বেশ পরিণত ও ছায়াপথটির ওজন সূর্যের ওজনের প্রায় ১০ হাজার কোটি গুণ। মহা বিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং থেকে ছায়াপথটির মাত্র ১১০ কোটি বছর অতিবাহিত করেছে। এত কম সময়ে একটি ছায়াপথ এতটা পরিণত হয়ে উঠতে পারে তা এর আগে বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। (আইএফএল সায়েন্স)

২২●দক্ষিণ কোরিয়ার 'কোরিয়ান এডভান্সড ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র বিজ্ঞানীরা ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পদ্ধতির সূচনা করেছেন। এতদিন বিজ্ঞানীরা ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে ক্যান্সার প্রতিহত করার পথে হেঁটেছেন। কিন্তু কোরিয়ান বিজ্ঞানীরা ক্যান্সার কোষকে পুনরায় স্বাভাবিক কোষে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা এই ব্যাপারে খুবই আশাবাদী এবং ইতিমধ্যে ইতিবাচক ফলাফল পেয়েছেন বলে ঐ গবেষণা সংস্থা থেকে জানানো হয়েছে। (কেএআইএসটি)

২৪●মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা প্রেরিত 'পার্কার সোলার প্রোব' সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছল। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সোলার প্রোবটি সূর্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে যানটি সূর্যের ৬১ লক্ষ কিমি দূরে অবস্থান করছে। এটা এখন পর্যন্ত রেকর্ড হলেও বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন শুধুমাত্র রেকর্ড ভাঙ্গার জন্য এই প্রোবটিকে পাঠানো হয়নি। আমাদের নিকটতম নক্ষত্রটিকে আরও বিশদভাবে জানতে বুঝতে ও বহু রহস্য ভেদ করাই বিজ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য। সেই কাজ পার্কার করে চলেছে। প্রোবটির মেয়াদ এই বছর শেষ হতে চলেছে বলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন। (স্পেস ডট কম)

২৭●পৃথিবীতে কার্বন ব্যাতীত প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আবার নক্ষত্র ব্যাতীত কার্বনের অস্তিত্ব থাকে না। কেবল কার্বনই নয় সমস্ত মৌলের উৎস হল নক্ষত্র। নক্ষত্রের অন্দরের

বিশেষ পরিবেশে এই মৌলগুলি তৈরী হয় ও প্রবল চাপের কারণে গ্যাস ও ধূলিকণা রূপে মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। কার্বন সহ প্রায় সমস্ত মৌল ছায়াপথের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় ও সেই ধূলিকণা থেকেই গ্রহ, উপগ্রহ সহ সমস্ত মহাজাগতিক বস্তুর সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি কানাডা ও আমেরিকার একদল বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে নক্ষত্রগুলি ধূলিকণা নিক্ষিপ্ত করে তখনই যখন তার কোন ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। এমনকি এই মৌল সম্বলিত ধূলিকণা দুই ছায়াপথের মধ্যবর্তী ইন্টারগ্যালাকটিক মাধ্যমে জমা হয়। পরবর্তীকালে তা ভেদ করে চলে যেতে পারে অন্য ছায়াপথের প্রয়োজনে বা ফিরে আসতে পারে তার পূর্বের ছায়াপথে। ধূলিকর্ণাগুলির ভ্রমণপথ ৪ লক্ষ আলোক-বর্ষ পর্যন্ত হতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান।(ইউরেক অ্যালার্ট)

জানুয়ারি, ২০২৫ ঃ

১●মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানাচ্ছে পার্কার সোরার প্রোব সূর্যের করোনা পরিমন্ডলে প্রবেশ করেছে ও প্রাথমিক সংঘাত সফলভাবে অতিক্রম করেছে। যানটির সঠিকভাবে তথ্য আদান প্রদানের কাজ করছে ও ঘন্টায় প্রায় ৪ লক্ষ ৩০ হাজার মাইল বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই গতি মনুষ্য নির্মিত কোন যান আজ পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি।(নাসা)

২●ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডশায়ার অঞ্চলে ভূবিজ্ঞানীরা মধ্য জুরাসিক যুগের ডাইনোসরের বিচরণক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কৃত বিচরণ ক্ষেত্রটি ছিল একসময় অগভীর হ্রদ যার তলদেশে ছিল চুনাপাথর। বর্তমানে যা শুষ্কভূমি যাতে একাধিক প্রজাতির ডাইনোসরের পদচিহ্নের জীবাশ্ম স্পষ্টতঃই দৃশমান। বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করে ঐ অঞ্চলে পাঁচটি বিচরণ পথের সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ঐ অঞ্চলে এখন পর্যন্ত তাঁরা ২০০টি জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন যার অনুমানিক বয়স প্রায় সাড়ে ষোল কোটি বছর। (বিবিসি)

৮●একটি বড় কারখানায় বা অফিসে যেমন কর্মীদের বিভিন্ন বিভাগে নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই একটি কোষের ভিতরে অসংখ্য প্রোটিন নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। ঐ প্রোটিনগুলি কোষের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থেকে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মতো দায়িত্ব পারন করে। সম্প্রতি সান ফ্রান্সিসকোর একদল কোষ বিজ্ঞানী মানবদেহের কোষের প্রোটিন মানচিত্র প্রকাশ করে কোষের মধ্যে তাদের অবস্থান, বিন্যাস, কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। সংক্রমণ বা আপদকালীন পরিস্থিতিতে প্রোটিনগুলি কি ভূমিকা পালন করে তা বিশদে ব্যাখ্যা করেন। (ইউরেক অ্যালার্ট)

১৩●প্রত্নতত্ত্ববিদরা ফ্রান্সের প্যারিস বেসিনের এক গুহায় ত্রিমাত্রিক মানচিত্রের সন্ধান পেয়েছেন। যার বয়স আনুমানিক ১৩ হাজার বছর। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু ত্রিমাত্রিক চিত্র এর আগে কোথাও পাওয়া যায়নি বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। আদিম মানুষের ত্রিমাত্রিক চিত্রের ধারণা বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করেছে। (সায়েন্স ডেইলি)

১৫●২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা একটি মহাকাশযান 'গাইয়া'-কে আকাশ গঙ্গা ছায়াপথে প্রেরণ করে। যার উদ্দেশ্য ছিল ছায়াপথের মানচিত্র তৈরী করা। দীর্ঘ ১১ বছর পর জ্বালানী নিঃশেষিত হওয়ার কারণে মহাকাষযানটি তার যাত্রা শেষ করেছে। তার কর্মজীবনে ২০ কোটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেছে ও তথ্য সরবরাহ করেছে। 'গাইয়া' প্রেরিত তথ্য আমাদের ছায়াপথকে আরও বিশদভাবে জানতে সাহায্য করেছে। (ইএসএ)

২২●ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হবার সাথে সাথে বিজ্ঞানের গবেষণার উপর কোপ নামিয়ে আনার হুমকি দিয়েছেন। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ যা সারা বিশ্বের বায়োমেডিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে তার ৪৭.৪ মিলিয়ন ডলারের অনুদান বন্ধ করতে চলেছে ট্রাম্প সরকার। বহু সরকারী বৈজ্ঞানিক পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে ও ভবিষ্যতে আরও ছাঁটাই করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ক্যান্সার, সমুদ্র বিজ্ঞান ও বহু গবেষণায় উল্লেখযোগ্যভাবে অনুদান হ্রাস করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ও বিজ্ঞান গবেষণার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিজ্ঞানের পড়ুয়া, অধ্যাপক, গবেষকেরা ওয়াশিংটন, বস্টন, লস এঞ্জেলেস মিচিগান সহ দেশের অন্যান্য বড় শহরে ট্রাম্প ও ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন। বহু নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী, নাসার প্রাক্তন বিজ্ঞানী ও দেশের সাধারণ মানুষ হাতে 'স্ট্যান্ড আপ ফর সায়েন্স', 'বিজ্ঞান অজ্ঞানতার প্রতিষেধক' ইত্যাদি প্লাকার্ড হাতে প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে। (সায়েন্স)

২৯●2024 YR4 নামক একটি গ্রহাণু পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৪ বিজ্ঞানীরা আনুমানিক ৪০×মি১০০টি আকারের এই গ্রহাণুকে আবিষ্কার করেন। প্রাথমিক হিসাবে বিজ্ঞানীরা জানান ২০৩২ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর গ্রহাণুটি পৃথিবী ঘেঁষে উড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে ও পৃথিবীর সাথে সংঘাতের সম্ভাবনা খুবই কম। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে যে বর্তমানে গ্রহাণুটির সাথে পৃথিবীর সংঘাতের সম্ভাবনা ১.৩%। তবে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ঐ গ্রহাণুর গতিবিধির উপর নজর রাখছেন। (এএসএ)

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

মানুষের ত্বকে কেন কেবল ভিটামিন D তৈরি হয়?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আসুন ভিটামিন D সম্বন্ধে একটু জানা যাক। ভিটামিন D হল একটি বিশেষ ধরনের ফ্যাট-দ্রবণীয় ভিটামিন, যা আমাদের শরীরে হাড় শক্তিশালী করা, ক্যালসিয়াম শোষণ করা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন D দুটি প্রধান রূপে পাওয়া যায় ঃ

* ভিটামিন D_3 (Cholecalciferol) ঃ এটি প্রধানত মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ত্বকে সূর্যালোকের সাহায্যে তৈরি হয়।

* ভিটামিন D_2 (Ergocalciferol) ঃ এটি কিছু ছত্রাক বা মাশরুম থেকে পাওয়া যায়।

এবারে দেখা যাক ভিটামিন D কীভাবে আমাদের ত্বকে তৈরি হয়

ভিটামিন D তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপে ঘটে ঃ

১. সূর্যের অতিবেগুনী বি-রশ্মি (UVB) এর ভূমিকা

মানুষের ত্বকের কোষে 7-Dehydrocholesterol (7-DHC) নামক একটি বিশেষ যৌগ থাকে। যখন সূর্যের অতিবেগুনী বি-রশ্মি ত্বকে পড়ে, তখন এটি 7-DHC কে পরিবর্তন করে প্রোভিটামিন D_3 তৈরি করে।

২. প্রোভিটামিন D_3 থেকে ভিটামিন D_3 তৈরি

তাপের কারণে প্রোভিটামিন D_3 ধীরে ধীরে ভিটামিন D_3(Cholecalciferol) এ পরিণত হয়। এই ধাপে কোনো উৎসেচেকের দরকার হয় না, এটি ত্বকের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

৩. যকৃতে প্রথম পরিবর্তন

রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে ভিটামিন D_3 যকৃতে যায়। সেখানে ২৫-হাইড্রক্সিলেজ (25-Hydroxylase) উৎসেচক এটিকে ২৫-হাইড্রক্সিভিটামিন D_3 [$25(OH)D_3$] বা Calcidiol এ রূপান্তর করে।

৪. বৃক্কে চূড়ান্ত সক্রিয়করণ

বৃক্কের ১-আলফা-হাইড্রক্সিলেজ (1α -Hydroxylase) উৎসেচক এটিকে সক্রিয় ভিটামিন D [$1,25(OH)_2D_3$] বা Calcitriol এ রূপান্তরিত করে। এই Calcitriol-ই শরীরের জন্য দরকারি সক্রিয় ভিটামিন D।

এবার প্রশ্ন হল মানষের ত্বকে কেন কেবল ভিটামিন D তৈরি হয়, কেন ভিটামিন A, B, C, E বা K তৈরি হয় না?

এর মূল কারণগুলো হল –

১. ভিটামিন D তৈরির জন্য ত্বকের নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। আগেই বলেছি 7-DHC হল একমাত্র রাসায়নিক, যা সূর্যের UVB রশ্মি দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে ভিটামিন D_3 তৈরি করতে পারে। অন্য কোনো ভিটামিন তৈরির জন্য ত্বকে এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নেই।

২. অন্যান্য ভিটামিন তৈরি হয় অন্ত্র, যকৃৎ বা ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে। যেমন – ভিটামিন A (রেটিনল) – যকৃতে সংরক্ষিত হয় এবং বিটা-ক্যারোটিন থেকে তৈরি হয়। ভিটামিন B-কমপ্লেক্স – অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া বা খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। ভিটামিন C – কিছু প্রাণী যকৃতে তৈরি করতে পারে, কিন্তু মানুষের শরীরে তা হয় না। টক জাতীয় ফলে থাকে। ভিটামিন K – অন্ত্রের ব্যাকটেরিযা তৈরি করে। ভিটামিন E – সরাসরি খাদ্য থেকে আসে, আমাদের শরীর নিজে এটি তৈরি করতে পারে না। অর্থাৎ এসব ভিটামিন তৈরি বা সংরক্ষণের জন্য যকৃৎ, অন্ত্র বা ব্যাকটেরিয়ার বিশেষ প্রক্রিয়া দরকার হয়, যা ত্বকে নেই।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাহলে মানুষের ত্বকে কেন ভিটামিন D তৈরির প্রয়োজন পড়ল?

এর কতগুলো কারণ আছে।

১. প্রাগৈতিহাসিক যুগে খাদ্য থেকে পর্যাপ্ত ভিটামিন D পাওয়া যেত না। মানুষের খাদ্যে ভিটামিন D এর সহজলভ্য উৎস কম ছিল। ভিটামিন D সাধারণত মাছ, যকৃৎ, ডিমের কুসুম ও কিছু দুগ্ধজাত পণ্য থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলো সবসময় সবার জন্য সহজলভ্য ছিল না। তাই প্রকৃতি বিকল্প হিসেবে ত্বককে ভিটামিন D তৈরির ক্ষমতা দিয়েছে।

২. ক্যালসিয়াম শুধু খাদ্য থেকে শোষিত হতে পারে, কিন্তু এটি শোষণে ভিটামিন D অপরিহার্য। মানুষের অস্থি ও দাঁতের

➔

সংগঠন সংবাদ

৯ই ফেব্রুয়ারি অভয়ার জন্মদিন ও তাঁর হত্যার ৬ মাস উপলক্ষ্যে কর্মসূচী

আমরা অভয়া মঞ্চের ডাকে কলেজ স্ট্রীট থেকে আর জি কর পর্যন্ত বিরাট মিছিলে সামিল হই।

পাশাপাশি ঐ দিন বনগাঁর জেয়ালাবাজার, লক্ষ্মীকান্তপুর, বেহালা, ঠাকুরপুকুরে সন্ধ্যায় 'দ্রোহের আলো' জ্বালানোর কর্মসূচীতে সামিল হই। স্থানীয় মানুষ প্রচন্ড আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের কর্মসূচীতে সামিল হন। এই দিন আমরা রাজ্যজুড়ে লিফলেটিং কর্মসূচি নিয়েছিলাম। লিফলেটের শিরনামে যেকোনো মূল্যে ন্যায় বিচার ছিনিয়ে আনার ডাক দেওয়া হয়।

৯ই মার্চ অভয়া মঞ্চের ডাকে মিছিল ও রাণুছায়া মঞ্চে জমায়েত সামিল

আমরা এইদিন হাজরা মোড় থেকে শুরু হওয়া মিছিলে সামিল হই। এদিন দু'টি মিছিল একত্রিত হয়েছিল বিড়লা তারামন্ডলের সামনে এসে। মিছিল শেষ হয় রাণুছায়া মঞ্চের সামনে গিয়ে। অনুষ্ঠান চলাকালীন রাস্তার উল্টোদিকে হওয়া ইলিয়ট পার্কের বসন্ত উৎসবের মাইকের শব্দ অভয়া মঞ্চের অনুষ্ঠানে অসুবিধা তৈরি করেছিল।

কোনা হাইস্কুলে কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী

সরস্বতী পূজার পরদিন হাওড়ার কোনা হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষের ডাকে আমরা একটি জীবাশ্ম ও পাথরের প্রদর্শনী করি। পাশাপাশি আমাদের মুখপত্রের প্রদর্শনী হয়।

বইমেলায় মুখপত্র নিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক

হাওড়ার ডোমজুড়ে আমরা আমাদের মুখপত্র সমীক্ষণ ও ইংরাজী মুখপত্র ইনসাইট সহ 'পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান' বই নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। বুক স্টলে জীবাশ্ম ও পাথর প্রদর্শনী হয়। এছাড়া বাঁকুড়ার বড়জোড়া, আসানসোলের বইমেলায় আমরা উপস্থিত থেকেছি।

২৩শে মার্চ ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

বনগাঁ, পাথরপ্রতিমা ও বেহালা ঠাকুরপুকুরে আমরা শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করেছিল। এই দিন ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীদের জীবন থেকে যে শিক্ষাগুলো উঠে আসে, তা আগামী ছাত্র-যুব সমাজের কাছে কতখানি শিক্ষণীয়, তা তুলে ধরা হয়।

➔

● *মানুষের ত্বকে কেন কেবল ভিটামিন D তৈরি হয়?*

গঠন ও দৃঢ়তা, স্নায়ুতন্ত্র ও পেশির কার্যকারিতা ঠিক রাখতে ক্যালসিয়াম দরকার। তাই মানুষের শরীর ভিটামিন D-এর অভাব পূরণের জন্য সূর্যালোক ব্যবহার করতে শিখেছে।

৩. ত্বক শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ এবং সূর্যের আলো সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে আসে। তাই ভিটামিন D উৎপাদনের জন্য ত্বকই সবচেয়ে ভালো জায়গা। কারণ ত্বক এমন অঙ্গ যেখানে সূর্যালোক পৌঁছায়।

৪. বিবর্তনীয় অভিযোজন – আদিম মানুষের মূল আবাস্থল ছিল আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল, যেখানে প্রচুর সূর্যালোক ছিল। সেই সময় ত্বকের মাধ্যমে ভিটামিন D তৈরি হওয়ায় এটি একটি কার্যকর উপায় হয়ে ওঠে। পরে যখন মানুষ অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলে আসে, তখন ত্বকের রঙ ফর্সা হয়ে যায়, যাতে কম সূর্যালোকেও বেশি ভিটামিন D তৈরি করা যায়।

অর্থাৎ "মানুষের ত্বকে কেন কেবল ভিটামিন D তৈরি হয়?" এই প্রশ্নের উত্তর সহজ করে বললে বলতে হয়; ভিটামিন D হল একটি বিশেষ ভিটামিন, যা ক্যালসিয়াম শোষণে গুরুত্বপূর্ণ। ত্বকে 7-Dehydrocholesterol (7-DHC) উপস্থিত থাকায় এটি সূর্যালোকের UVB রশ্মি শোষণ করে ভিটামিন D তৈরি করতে পারে। অন্য কোনো ভিটামিনের জন্য ত্বকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান নেই, তাই সেগুলো ত্বকে তৈরি হয় না। খাদ্যে কোনো ভিটামিন D এর অভাব থাকায় এবং সূর্যালোক সহজলভ্য হওয়ায় ত্বক ভিটামিন D তৈরির দায়িত্ব পেয়েছে। ■

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস উদ্‌যাপন

গত ৮ই মার্চ দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদনে বিজ্ঞান মনস্ক আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস পালন করে অনুষ্ঠানের শুরুতে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে একটি মিছিল সুজাতা সদনে যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের সম্পাদক সংগঠনের একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। সেখানে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সহ বর্তমানে তা কিভাবে শাসকশ্রেণীর দ্বারা বুর্জোয়া নারী দিবসে পরিণত হয়েছে তার ইতিবৃত্ত দেন। অভয়ার ন্যায় বিচার পাওয়া তখনই সম্ভব যখন শ্রমজীবী জনতা সমস্ত ক্ষেত্রকে স্তব্ধ করে দেবে। তাই শ্রমজীবী জনতাকে এই আন্দোলনে সামিল করার লক্ষ্যে 'অভয়া মঞ্চকে' এগিয়ে যেতে হবে – প্রতিবেদনে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে। (প্রতিবেদনটি স্বতন্ত্রভাবে এই নিবন্ধের শেষে দেওয়া হল) অভয়া আন্দোলন কিভাবে শ্রমজীবী নারী দিবসের মাহাত্ম্যকে তুলে ধরেছে তা শ্রমজীবী নারীদের বক্তব্যে ফুটে ওঠে।

চুক্তির ভিত্তিতে দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে সরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ল্যাবোরেটরিতে পরিক্ষক হিসাবে কর্মরতা একজন বক্তা বলেন – "স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশির ভাগই মহিলা কর্মচারী। খুব কম মজুরিতে নারী-পুরুষ রক্ত-ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিসেবা দিয়ে চলেছেন। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে একটা অংশে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবই দেখা যাচ্ছে। **একজন মহিলাকে শুধু শারীরিক নয় কথাবার্তার মধ্য দিয়েও অবমাননা করা যায়।** অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে নৃশংসতা কতদূর হতে পারে তা দেখা গেছে। অভয়া আন্দোলনে যখনই সোচ্চার হয়েছি আমরা তখনই শুনেছি – 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে অভয়া বানিয়ে দেবো'। সমাজের সকল স্তরে একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দরকার। এই পচাগলা ব্যবস্থার অবসানে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যেতে হবে।"

কলকাতা শহরের এক গৃহ-সহায়িকা তার বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। শরীর খুব খারাপ না হলে তাঁরা ছুটি পান না। **ছুটির কথা বলতেও যেন ভয় পান – যদি কাজ চলে যায়। অসময়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় যেতে ভয় পান। মাসের শেষে কাজের যে মজুরী পান তাতে তাঁদের সংসার চলে না।** অভয়া আন্দোলনে সে নিয়মিত যোগদান করেছেন। সমস্ত স্তরে একজোট হয়ে আন্দোলন করলে তবেই বিচার পাওয়া যাবে বলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গ্রামের একজন নারী গার্মেন্ট শ্রমিক তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন গার্মেন্ট শ্রমিকদের করুন অবস্থা। হপ্তা শেষে শনিবার যখন তাঁরা মজুরী নিতে যান তখন মালিক তার আসল রূপ দেখায়। নানা অছিলায় টাকা কেটে নেন। একে স্বল্প মজুরিতে কাজ, তার ওপর মালিকের টাকা কেটে নেওয়া। টাকা বাড়াবার কথা বললে মালিক বলে অন্য কোথাও কাজ দেখে নিতে। **শোষণের ব্যাপারে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই।** শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই সমাজ ব্যবস্থা বদল সম্ভব হবে।

কলকাতা শহরের এক নারী রিক্সা চালক বলেন – "ভয়ই মেয়েদের মূল সমস্যা। গত ন-বছর ধরে রিক্সা চালিয়ে সংসার চালাচ্ছি, ছেলে-মেয়ে মানুষ করছি। তারও আগে লোকের বাড়ি কাজ করেছি, মাছ বেচেছি, সব্জি বেচেছি, **আজ যে আমি রিক্সার হ্যান্ডেলটা ধরেছি আমার স্বাধীনতার জন্য, পঞ্চাশটা পুরুষ রিক্সা চালকের মাঝে লড়াই করেছি, মেয়েরা নির্ভয়ে এগিয়ে যাক।"**

একজন আই.টি. শিল্পের নারী কর্মী তাঁদের ক্ষেত্রে শ্রম শোষণের নিদারুন চিত্র তুলে ধরেন। অনেক স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এই আই.টি. চাকরিতে ঢোকেন। চাকরিতে ঢোকার সময় অনেক সুবিধার কথা তাদের বলা হয়। কিন্তু চাকরীতে ঢোকার পর আসল চিত্র ধরা পরে। একজন মানুষের আট ঘন্টা কাজ, আট ঘন্টা বিশ্রাম ও আট ঘন্টা অন্যান্য কাজ করতে হয়। **সেখানে এই কাজে ৯ ঘন্টা, ১০ ঘন্টা, ১১ ঘন্টা এমনকি ১৬ ঘন্টা পেরিয়ে যায়, তার জন্য পায়না ওভারটাইম**

বা ছুটি। ইনফোসিস কর্তা বলেছেন সপ্তাহে ৭০ ঘন্টা কাজ করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের ফলে ভোটাধিকার আমরা পেলেও কোন সুযোগ-সুবিধা নেই এবং শোষণের শিকার হতে হয়। **এই আই.টি. চাকরীতে পুরুষেরা থার্টি টু ফরটি পারসেন্ট বেশি বেতন পায়। এই বিষয়ে আওয়াজ তুললে বলা হয় – তাদের ভাগ্য ভালো যে তারা এই কাজ করছে, তাদের মায়েরা তো আজও গৃহবধু।**

আর জি কর আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নেওয়াতে পুলিশ থেকেও ফোন এসেছে এমনকি ম্যানেজমেন্ট থেকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে যে – এই আন্দোলনে থাকলে আর চাকরী করতে হবে না। সে সব হুমকি উপেক্ষা করেই তিনি আন্দোলনে আছেন। অর্ধেক আকাশের প্রকৃত অর্থ এখনো তিনি খুঁজে পাননি। পুরুষেরাও শোষিত হন তবে নারীরা ঘরে বাইরে উভয় জায়গাতেই শোষিত হয়। তিনি একটি ইউনিয়নে যুক্ত এবং তার লড়াই চালিয়ে যাবেন।

একজন প্রত্যন্ত কোলিয়ারি অঞ্চলের শ্রমজীবী নারী বলেন – আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস পালিত হয় তাঁদের মতো শ্রমজীবী নারীদের সমান অধিকার ও মুক্তির জন্য। তিনি যে অঞ্চলে থাকেন বেশিরভাগ নারীরাই এই সম্বন্ধে কিছু জানে না। মেয়েরা দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য কয়লা খাদানে কলয়া তোলে, লোকের বাড়িতে কাজ করে, ক্ষেতে-মাঠে চাষের কাজ করে, রাজমিস্ত্রীর সাথে জোগারের কাজ করে, চাষেরও কাজ করে, আর ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে বাড়ির কাজ, রান্নার কাজ, বাচ্চাদের দেখাশোনার কাজ করতে হয়। তার ওপর স্বামীরা মাতাল হলে তো কথাই নেই। এর থেকে মুক্তির উপায় কি? রাশিয়া নামক একটি দেশে শ্রমিক-কৃষক-নারীরা এক হয়ে আন্দোলন করেছিলো, বিপ্লব ঘটিয়েছিল। তিনি সবাইকে আহ্বান করে বলেন – **'এই ব্যবস্থা থেকে বেরোবার যদি এটাই পথ হয়, তবে চলুন না আমরা সবাই এক হয়ে সেটাই করি।'**

সুন্দরবনের এক বেসরকারি গ্রামীণ স্কুলের শিক্ষিকা বলেন – তিনি এমন একটা জায়গা (সুন্দরবন) থেকে এসেছেন যেখানে একটা বন্যার রেশ কাটতে না কাটতেই আর একটা বন্যা এসে পড়ে, এবং বেশির ভাগ মানুষই কৃষিজীবী। অন্যান্য কাজের সুযোগ খুব কম। সে নিজেও এক কৃষক পরিবারের মেয়ে এবং বউ। আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা মাইনে, যাতে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি অথচ সংসার চলে না ঠিক মতো। তাই সে আর তার স্বামী দুইবেলা টিউশানি করে সংসার চালায়। নারী-পুরুষ সবারই অবস্থা একরকম। **কৃষিক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের পুরুষদের তুলনায় আরো কম রোজ দেওয়া হয়। সামন্ততান্ত্রিক ধর্ষণ-নিপীড়ন অব্যাহত। আট থেকে আশি কেউই বাদ যায় না। এই রকম পরিস্থিতিতে আর জি কর-এর ঘটনা সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছে।** যেখানে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির কারণে পরিবারের মেয়ে-বউরা ঘোমটার আড়ালে থাকে, গলা চড়িয়ে কথা বলা যায় না, সেখানে অভয়া আন্দোলনে সে মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে আর তার ভাশুর পিছনে দাড়িয়ে তাতে গলা মেলাচ্ছে সেটা অকল্পনীয়। বিয়ের পর থেকেই সে লাগাতার সামন্ত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, প্রতিবাদ চালিয়ে গেছে, এটা তারই ফলশ্রুতি। নারীদের নিজেদের শোষণ মুক্তির জন্য লাগাতার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, পুরুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তবেই জয় হবে। আর কর্তব্য হচ্ছে যারা জানে না, এই বিষয়ে তাদের শিক্ষিত করা। এটা না করলে এই দিনটা উদ্‌যাপন ব্যর্থ হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষ্মিকান্তপুরের এক পার্শ্ব শিক্ষিকা বলেন – এই সমাজ নারীদের মানুষ নয়, মেয়ে-মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, তাকে খাটিয়ে নিংড়ে যে ভাবে শুষে নেয় তা তার মাকে দেখে শিখেছে। তাকে চার হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয় এম.এ. পাশ বলে, আর যারা তা নয় তাদের সাড়ে তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে নিংড়ে নেওয়া হয়। **যে সমাজ নারীকে মানুষ বলে মর্যাদা দেয় না, যে সমাজ নারীকে শোষণ করে তা একদিন ইতিহাসে অসভ্য সমাজ হিসাবে স্থান পাবে। মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ অসভ্যতা।** তিনি আরো বলেন – "আমরা অবলা নই, দুর্বল নই, আমরা সব কাজ পারি। আমরা দয়া-ভিক্ষা-করুণা চাই না, বুর্জোয়া নারীর মতো গলায় কলার বাঁধা পোষা প্রাণী হয়েও থাকতে চাই না, আবার দেবীও হতে চাই না। ... আমাদের শ্রম শোষণ করে যে এক শ্রেণীর মানুষ টিকে রয়েছে সেই সমাজটাকে ভাঙতে চাই। ... শ্রমজীবী পুরুষদের সাথে নিয়ে এই শোষণমূলক সমাজটা ভাঙতে চাই। ৮ই মার্চ শপথ নেবার দিন – এই সমাজটা ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ে তোলার।"

অপর একজন কৃষি-মজুর পরিবারের সন্তান এবং বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা সকলের সাথে ভাগ করে নেন। তিনি বলেন – তাঁর মা কিভাবে বাইরে মজুরের কাজ করে ঘরে এসে সংসারের কাজকর্ম করে তাঁদের মানুষ করেন। তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাও একই রকম। তিনি **যে প্রাইভেট স্কুলে পড়ান সেখানেও প্রবল অনিশ্চয়তা। যখন তখন কোন কারণ না দেখিয়ে ছাড়িয়ে দেবে। বেতনও বলার মতো নয়। পুরুষদের সমান কাজ করলেও সমান মর্যাদা দেয় না।** তাঁকেও স্কুলে সকাল সাতটা থেকে বিকাল চারটে অবধি টানা ক্লাস করে বাড়িতে এসে ঘর, বর, বাচ্চা সামলাতে হয়। সমাজে নারীদের ভোগ্যপণ্য হিসাবে দেখা হয়। এই সমাজ নারীকে যৌনকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চায়। আর জি করের ঘটনা আমাদের দেখিয়ে দেয় শত আন্দোলন করলেও নারীদের সঠিক বিচার এই সমাজ দিচ্ছে না। সকল শ্রমজীবী নারী পুরুষ

এক সাথে মিলে এই সমাজ বদল করতে হবে।

একজন মহিলা মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ বলেন – **তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা আলাদা নয়। ঘর থেকেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে সংসারে সবার কাজ সমান।** আমাদের কাজের ক্ষেত্রতে নারী-পুরুষ সকলের ঘরের থেকেও তিনগুণ বেশি শোষণ হয় বাইরে। সবাইকে এগিয়ে এসে আর জি করের মতো লড়াই করতে হবে।

অভয়া মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক ডঃ পুণ্যব্রত গুণকে কিছু বলার অনুরোধ জানালে তিনি তার অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করে নেন। প্রথমেই তিনি বিজ্ঞান মনস্ককে এই রকম একটি সভার আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানান। **তিনি আরো বলেন, এই প্রোগ্রামে আসার আগে তিনি আর একটি সভাতে** ছিলেন, সেখানে শ্রমজীবী নারীদের কি কি অধিকার ও দাবি **হওয়া উচিৎ সেই নিয়ে তাঁর মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মতামত রেখেছেন। এখানে এসে তিনি দেখেন যে শ্রমজীবী নারীরা তাদের সমস্যা ও সমাধানের পথ নিয়ে নিজেরাই বক্তব্য রাখছেন,** তিনি আবারও অভিনন্দন জানিয়ে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

অভয়া আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ ডঃ আস্‌ফাকুল্লা নাইয়া বলেন – শ্রমজীবী নারীদের যুদ্ধ, জীবন সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি কিছুটা জানেন, সময় পেলে আরো গভীরে পড়তে পারতেন। তাদের ডাক্তারি ক্ষেত্রে মহিলা এবং পুরুষের ভেদাভেদ সেরকম নেই, তবে শ্রমিকদের বিভিন্ন কাজের জায়গায় নারী-পুরুষের ভেদাভেদ আছে। নারী শ্রমিকদের কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। পৃথিবীর ১৭টা থেকে ১৮টি দেশে প্রশাসনিক উচ্চপদে নারীরা আছেন এমনকি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একজন নারী, তবুও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কেন? আসলে বাড়ি, সমাজ কোথাওই এই সম্পর্কে ভাবতে শেখানো হয় না। একটা বাচ্চার প্রথম বাসস্থান, প্রথম খাদ্য, প্রথম হার্ট-বিট সবটাই হয় মায়ের গর্ভে, এক নারী গর্ভে। বাচ্চাটি জন্মাবার পরে আর তাকে দুধ পান করানো, তাকে যত্নে বড় করে যে সেও এক নারী। আমরা যত বড় হচ্ছি তত আমাদের মধ্যে বিভেদ শুরু হয়ে যায়। কেন? একজন প্রেগনেন্ট নারীকে রোগী ভাবা হয়। শাসক বুকে হাত দিয়ে বুক চাপড়ে বলছে আমরা প্রেগনেন্ট মায়েদের জন্য এই করেছি, সেই করেছি, অবক্ষয়টা শুরু হয় সেখান থেকে। **ক্ষমতার কোন লিঙ্গ হয় না। ক্ষমতায় যেই থাক, ব্ল্যাক, হোয়াইট, রেড, গ্রীন যাই বলা হোক না কেন ক্ষমতা তাকে ব্যবহার করবে। ... প্রত্যেকটা সামাজিক যুদ্ধ, লড়াই হয় শান্তি ফিরে আসার জন্য। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস একটা স্পেসাল দিন নয়, প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা দিন আমাদের এটা পালন করতে হবে।**

ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় স্যার ডঃ অর্নব সেনগুপ্ত প্রথমেই বিজ্ঞান মনস্ক সংগঠনকে অভিনন্দন জানান এই রকম এক উন্নত সাংস্কৃতিক স্তরে অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। তিনি আরো বলেন – **"গত আগস্ট মাসের অভয়ার ঘটনার পর থেকে যে অভূতপূর্ব সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে ... তার সঙ্গে আমরা সবাই একাত্ম অনুভব করেছি। এই আন্দোলন থেকে জেন্ডার ইস্যু যেভাবে উঠে এসেছে, যাতে নারীদের সুরক্ষিত করার ওয়ার্ক সিকিউরিটির বা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রশ্ন, কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং একটা স্বাধীন সচেতনভাবে পরমুখাপেক্ষি না হয়ে সমাজে এগিয়ে যাওয়ার যে নেতৃত্বের প্রশ্ন উঠে এসেছে, এবং সেই সব কিছু নিয়ে যে অভূতপূর্ব গণচেতনা গড়ে উঠেছে, সেটাকে আরো সুসংবদ্ধ-সুনেতৃত্বে এবং নিয়ন্ত্রিত সামাজিক নেতৃত্বের মাধ্যমে আরো বড় সামাজিক আন্দোলন এবং একটা দাবিদাওয়া পূরণের জায়গায় নিয়ে যাবার আরো হয়তো সুযোগ ছিলো। বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকায় যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়, বহুক্ষেত্রে তা ফ্যাসানেবল হয়ে গেছে। ... নারীবাদের নাম করে পুরুষ-বিরোধিতা হয়, এবং মাঝে মাঝে সেটা বেশ রিজিড, বেশ কঠিন, কঠোর, সমাজটাকে ওরা-আমরা ভাগ করে ফেলে এই ফেমিনিস্ট এপ্রোচ। নারী মুক্তি আন্দোলন, সমাজ মুক্তির আন্দোলন থেকে আলাদা কিছু নয়। শোষণহীন সমাজ গড়ার আন্দোলনের একটা অংশ নারী আন্দোলন।" তিনি এঙ্গেলেসের বিখ্যাত একটি বই – 'পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব' সহজবদ্ধভাবে সকলকে চর্চা করতে বলেন, যাতে নারী আন্দোলন ফেমিনিস্ট আন্দোলনের গোলক ধাঁধায় হারিয়ে না যায়। .. আর জি কর আন্দোলনের এখনো কিছুটা অবশেষ আছে সমাজের বুকে, সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে যথোপযুক্ত একটা সংগঠন গড়ে তোলা দরকার, যেখানে সমস্ত ধরনের মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারবে। যার মাধ্যমে সমাজ মুক্তির আন্দোলন তথা নারীমুক্তির আন্দোলন একই সাথে উচ্চারিত হবে।**

লাল ঝান্ডা মজদুর ইউনিয়নের বক্তা বলেন যে – **নারীমুক্তির প্রশ্নটা সমাজে অবধারিতভাবে স্বাভাবিক নিয়মে এসেছে সমাজ বিকাশের সাথে সাথে।** নারীর পুরুষের মতো পৃথক জৈবিক সত্তা থাকলেও তাকে শুধু সেই কারণ দেখিয়ে শ্রমজীবীদের থেকে আলাদা করার একটা প্রয়াস বর্তমানে চলেছে। সেটা কোনভাবেই সঠিক বিজ্ঞান সম্মত নয়।

সবশেষে সভাপতিমন্ডলী থেকে সমাপ্তি ভাষণ হয়।

পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালক খুবই দক্ষতার সাথে সঞ্চালনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন বক্তব্যর রেশ ধরে রোজা লুক্সেমবার্গ, কোলনতাই, সু-চি-লিং, ক্লারা জেটক্লিন, লেনিন এর মন্তব্য এবং বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরে সভাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। তিনটি গান পরিবেশিত হয় ও শ্রমজীবী পরিবারের একটি কিশোরী খুব সুন্দর ভাবে একটি কবিতা আবৃত্তি করে। ■

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস

উপস্থিত সংগ্রামী বন্ধুগণ,

আজ ৮ই মার্চ, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে প্রায় ১৫ হাজার নারী দর্জি শ্রমিক মেয়েদের ভোটাধিকার ও সমানাধিকারের দাবিতে এক ঐতিহাসিক মিছিল করে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে শ্রমিক আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী নারীদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এরপর থেকেই ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস পালন হচ্ছে।

শ্রমজীবী জনতার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ায় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাষ্ট্রসংঘ তথা সমগ্র বিশ্বের শাসকশ্রেণী দিনটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য ভুলিয়ে দিতে একই দিনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছে।

রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা পর বিশ্বজুড়ে অসংখ্য বহুজাতিক কোম্পানি নারীর মানবিক সত্তাকে বাদ দিয়ে তাকে নিছক পণ্যরূপে নানা রঙের মোড়কে সাজিয়ে বাজারে হাজির করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নারী স্বাধীনতার নামে নারীদের (অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদেরও) যৌনতা তুলে ধরার জন্য নানা প্রচার চালাচ্ছে। নারী দিবস তাই পুঁজিপতিদের কাছে হয়ে উঠেছে মুনাফা লোটার এক চমৎকার উপায়।

নারীবাদের নামে নানা সংগঠন শুধুমাত্র পুরুষদের নারী সমস্যার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে পুরুষ বিদ্বেষ ছড়ায়। নারীর সমানাধিকারের নামে বিদ্যমান শোষণমূলক সমাজে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শে প্রভাবিত পুরুষরা যে উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যাভিচার, বহুগামিতা চালিয়ে যায়, নারীদেরও তা করতে উদ্বুদ্ধ করে। দেহব্যবসার মত ঘৃণ্য পেশাকে সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনসঙ্গত করার দাবি জানায়।

বুর্জোয়া দর্শনের ধারক বাহকরা আমাদের শেখায় মানব সমাজ, নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গে বিভক্ত। তারা এটা করে, মানব সমাজ যে আসলে উৎপাদনের উপায় উপকরনের মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণী বিভক্ত, এই সত্য আড়াল করার জন্য।

মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকে নারীরা কিন্তু আজকের মত পিতৃতন্ত্রের অধীন ছিল না। আদিতে মানব সমাজ ছিল গোত্র বা গোষ্ঠী ভিত্তিক, মাতৃতান্ত্রিক এবং সাম্যতন্ত্রী। মাতৃরক্ত সম্পর্কিত মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটি গোষ্ঠী বা গোত্র। পিতৃত্বের নিশ্চয়তা না থাকার জন্য বংশধারা কেবল মাতৃরক্ত সম্পর্কিত ছিল। নারী পুরুষ মিলে যে খাদ্য আহরণ করত তা সকলে ভাগ করে খেত। তাই সমাজ ছিল শোষণহীন, সাম্যতন্ত্রী।

বন্যাবস্থা থেকে তথাকথিত সভ্য সমাজে বিবর্তনের পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগোষ্ঠীগুলি ভেঙে নতুন নতুন উপগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। গোত্রভিত্তিক সমাজ ভেঙে পুনালুয়ান ও জোড়বাঁধা পরিবারের জন্ম হয় বর্বর যুগে। বর্বর যুগের উর্ধ্বস্তরে জন্ম হয় এক পতি-পত্নীর পরিবার। কিন্তু এই এক পতি-পত্নী পরিবারে পুরুষের বহু পত্নী বা উপপত্নী রাখা অগৌরবের ছিল না। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে বহুপতি বা উপপতি রাখা ছিল নিষিদ্ধ। গোপনে বা প্রকাশ্যে পুরুষের জন্য এই রীতি আজও বহাল আছে। মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ এবং নারীকে গৃহস্থালীর কাজে আবদ্ধ রেখে পুরুষের অধীনতা পাশে আবদ্ধ করা ছিল নারী জাতির ঐতিহাসিক পরাজয়। এই ধারা আজও অব্যাহত আছে।

নারীর জীবনে এই অবস্থানের পরিবর্তনের উৎস রয়েছে সমাজ বিবর্তনের পর্যায়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে। বন্যাবস্থা কাটিয়ে মানব সমাজ শিকার, পশুপালন ও কৃষিকাজ শুরু করে। ধাতুর ব্যবহারে হাতিয়ার উন্নত হয়, যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হয়। অরণ্য ও জমির অধিকার নিয়ে জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় বর্বর যুগে। যুদ্ধবন্দিদের দাসে পরিণত করা হয়। বন্দি দাসেদের দিয়ে পশুপালন ও কৃষি কাজের চাহিদা পূরণ হয়। এইভাবে দাস প্রথার প্রচলন হয়। শুরুতে নারী পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাজন ছিল স্বাভাবিক। পুরুষরা খাদ্য সংগ্রহ ও যুদ্ধ করত আর নারীরা গৃহস্থালী দেখার সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন ও পোষাক তৈরি করত। প্রথমে উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের হিসেবে সামাজিক সম্পদ নারী-পুরুষের মধ্যে বিভাজিত হয়। পশুধন, কৃষিজ ফসল, হাতিয়ার, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধবন্দি দাস

ছিল পুরুষের মালিকানায়, আর গৃহস্থালীর জিনিস, তৈজসপত্রের মালিকানা ছিল নারীর। বাড়ি, বাগান, নৌকা ছিল সাধারণ মালিকানায়। উৎপাদনের কাজে বন্দি দাসেদের ব্যবহার বিরাট আকারে সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করল। পশুধন ও কৃষিজ ফসল উদ্বৃত্ত হওয়ার পর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হল বিনিময়। এই রূপের সামাজিক বিভাজন এবং বিনিময় প্রথা শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে মানব সমাজ – দাস ও দাসমালিকে বিভক্ত হল। আর অন্যদিকে ঘরে-বাইরে পুরুষের আধিপত্য সৃষ্টি হল এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বদলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হল। নারী হয়ে উঠল পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র।

শ্রমিকশ্রেণীর নেত্রী তথা সমাজ বিজ্ঞানী রোজা লুক্সেমবার্গ বলেছেন – মানব সমাজে নারীরা সব সময় কঠিন কাজ করে এসেছেন। অসভ্য সমাজে মেয়েরা ভারী মাল বহন এবং খাদ্য সংগ্রহ করতো। আদিম গ্রামে চাষ, ফসল তোলা ও মাটির পাত্র বানাতো, প্রাচীনকালে দাসরূপী নারী প্রভুর সেবা করতো। প্রভুর সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়াতো, মধ্য যুগে নারী সামন্তপ্রভুদের সেবা করতো, তাঁত চালাতো। ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নারীরা সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে অতএব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করতো। তাদের দুঃসহ গৃহস্থালী কাজের বন্দিশালায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পুঁজিবাদই নারীকে প্রথম পারিবারিক বন্ধন দশা থেকে তুলে সামাজিক জোয়ালে আবদ্ধ করেছে। অন্যের জমিতে, ওয়ার্কশপে, বিল্ডিং-এ অফিসে, ফ্যাক্টরিতে, মালগুদামে কাজ করতে বাধ্য করেছে।

শ্রীমতী রোজা দেখিয়েছেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীদের সকলের অবস্থান এক নয়। তিনি বলেছেন, বুর্জোয়া নারী হল সমাজের পরগাছা, তার অন্যতম কাজ হল শোষণের ফল ভোগ করা। পাতিবুর্জোয়া নারী হল পারিবারিক ঘোড়া। আধুনিক সর্বহারা নারীই হল মানুষরূপে আবির্ভূত প্রথম নারী, কেননা সর্বহারাদের সংগ্রামই হল প্রথম সংগ্রাম যে সংগ্রাম মানুষদের তৈরি করে মানবসভ্যতা-সংস্কৃতিতে অবদান রাখার জন্য।

সম্পত্তিবান নারীর কাছে ঘরই তার বিশ্ব। আর সর্বহারা নারীর কাছে সমগ্র বিশ্বই হল ঘর, হাসি-কান্না, নৃশংসতায় মিশ্রিত তার বিশ্ব।

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারীমুক্তি বা নারীদের উপর শোষণ-শাসন, নির্যাতনের অবসান করতে সমাজ বিজ্ঞানী তথা শ্রমিক শ্রেণীর নেতা লেনিন তাই বলেছেন –

প্রথম পদক্ষেপ হল পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমজীবী নারী-পুরুষদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

দ্বিতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল জমি ও ফ্যাক্টরিগুলির উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো। এই পদক্ষেপই, একমাত্র এই পদক্ষেপই নারীদের সম্পূর্ণ তথা প্রকৃত মুক্তির রাস্তা খুলে দেয়।

ব্যক্তিগত গৃহস্থালীর কাজকে বৃহদাকার সমাজতান্ত্রিক গৃহস্থালী পরিসেবার দিকে উত্তরণের মধ্য দিয়ে নারীদের গৃহস্থালীর বন্ধন থেকে মুক্তির রাস্তা খুলে দেয়।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ দেশে মহান সর্বহারা অক্টোবর বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে প্রথমেই নারীদের সমান আইনী অধিকার প্রণয়ন করে। এরপর কালকারখানা রাষ্ট্রীয়করণ এবং ধাপে ধাপে জমির উপর সামাজিক অধিকার কায়েম শুরু করে। নারীদের গৃহস্থালীর বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য একদিকে মহল্লায় মহল্লায় সামাজিক রান্নাঘর স্থাপন এবং অন্যদিকে শিশুদের জন্য মায়ের কর্মক্ষেত্রে বিনামূল্যে ক্রেশ চালু করে। গণিকাদের সামাজিক উৎপাদনে সামিল করে গণিকাবৃত্তি চিরতরে নির্মূল করেছিল। বিপ্লবের পর গণ প্রজাতান্ত্রিক চীনেও একই পদক্ষেপের সূচনা হয়। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রে নারীমুক্তির এই কর্মকান্ডের চাপেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি নারীদের ভোটাধিকার এবং অন্যান্য বহু অধিকার দিতে বাধ্য হয়।

বর্তমান সমাজ এবং সমাজে নারীদের অবস্থার দিকে তাকান। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে চরম মন্দা, ছাঁটাই, শিক্ষা, স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে পুরোপুরি পণ্য করে তোলা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য, দুর্নীতি, লাগাতার খুন-ধর্ষণ, দাঙ্গায় বিধ্বস্ত সমাজ। কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, ঘরে-বাইরে কোথাও নারীদের এবং বহুক্ষেত্রে পুরুষদেরও কোনও নিরাপত্তা নেই। বাগিচা, খনি, ইটভাঁটা, কৃষি-শিল্প, পরিসেবার কাজে পুরুষদের নেই বাঁচার মতো মজুরি। মেয়েদের মজুরি বহু ক্ষেত্রেই আরও কম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সামাজিক ক্ষেত্রেও নিরন্তর প্রতিফলিত হচ্ছে। নেশাদ্রব্য এবং যৌনতা এখন এক বিরাট মুনাফাদায়ী ক্ষেত্র। শাসকশ্রেণী নানা কৌশলে এর প্রচার-প্রসার করছে। এরই পরিণতিতে যুবসমাজের নৈতিক মূল্যবোধ শাসকশ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ফলে ধর্ষণ, নানারূপের নারী নির্যাতন দিন প্রতিদিন বাড়ছে।

এরাজ্যে বিরাটি-ধানতলা-বানতলা-কামদুনি'র মত অসংখ্য ঘটনা এবং অন্য রাজ্যে কাঠুয়া-হাথরাস-উন্নাও-নির্ভয়ার

মত ঘটনার পর আর জি করের ঘটনা এই সমাজে নারীর স্থান কোথায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আর জি করের পর প্রায় প্রতিদিনই জয়নগর থেকে জয়গাঁও-এর ঘটনা ঘটে চলেছে।

৯ই অগাস্ট ২০২৪, আর জি কর মেডিকেল কলেজে আমাদের তিলোত্তমা বা অভয়াকে পৈশাচিকভাবে তার কর্মস্থলে কর্তব্যরত অবস্থায় খুন ও ধর্ষণ এবং প্রশাসনিকভাবে প্রমাণ লোপাটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ, সারা দেশ এমনকি বিশ্বের দেশে দেশে ন্যায় বিচারের দাবিতে এবং নারী নির্যাতনের অবসানের দাবিতে এক অভূতপূর্ণ গণ আন্দোলন শুরু হয়েছে। আমাদের সংগঠন শুরু থেকেই এই আন্দোলনে সামিল আছে। এই আন্দোলনে শুধু ডাক্তার সমাজ নয়, অসংখ্য গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এই আন্দোলনের মধ্য থেকে যে 'অভয়া মঞ্চ' গড়ে উঠেছে আমরা প্রথম দিন থেকেই তার শরীক।

দীর্ঘ ৭ মাস ধরে প্রশাসন, ন্যায়ালয়, কেন্দ্র-রাজ্য নির্বিশেষে বিভিন্ন এজেন্সিগুলির ন্যায় বিচার বিরোধী ভূমিকা দেখে একে এক নির্মম প্রশাসনিক হত্যাকান্ড বলা কি অসঙ্গত হবে? সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলরত জনতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে। তাই জনতা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজপথে আন্দোলন চলবে। শ্রমজীবী জনতাকে আরও ব্যাপক আকারে আন্দোলনে সামিল করতে লড়াই রাজপথ থেকে আলপথে ছড়িয়ে পড়বে। কলকারখানা-খনি-মাঠ-অফিস-ইটভাটা-বাগিচায় কর্মরত শ্রমজীবী জনতাই সমাজের চালিকাশক্তি। তাঁরাই পারেন কল-মিল-খনি-বাগিচা-মাঠঘাটের উৎপাদন ও পরিসেবা ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে যে কোনও মূল্যে ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনতে রাষ্ট্রশক্তিকে বাধ্য করতে। জনতা সেই দিনের অপেক্ষায় আছেন।

সবশেষে একটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের সংগঠন হয়ে আমরা কেন শ্রমজীবী নারীদিবস পালনের ডাক দিয়েছি? আমরা কেন নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের সামনের সারিতে?

বিজ্ঞান মানে শুধু প্রকৃতি বিজ্ঞান নয়, সমাজ বিজ্ঞানও বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে, অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করতে, অধিকার সচেতন করতে হলে সমস্যাগুলি উৎস থেকে নির্মূল করতে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও সহজলভ্যতাই যেমন মানুষকে ওঝা গুণিন, ঝাড়ফুক, তুক্তাকের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করতে পারে তেমনই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার ও নিপীড়নের অবসান করতে হলে যে আর্থ-সামাজিক ভিত্তির উপর শোষণ-দমন-পীড়ন টিকে আছে তার ভিত্তিস্থলে আঘাত হানতে হয়। এটাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক রাস্তা। এই পচাগলা বিদ্যমান সমাজের অবসান করে সকল শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা সকল শ্রমজীবী মানুষের জন্য শোষণ-নিপীড়ন মুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা আমরা বার বার পৌঁছে দেই। এই কারণেই আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব দিবস, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস ইত্যাদি পালন করি।

মানব মুক্তির পথে যে শত সহস্র শ্রমজীবী নারী তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, যে শ্রমজীবী নারীরা অকুতোভয়ে এই সংগ্রাম করেছেন ও করে চলেছেন আসুন তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস দীর্ঘজীবী হোক।

৮ই মার্চ ২০২৫

ধন্যবাদান্তে
বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ

সমাজ দর্পণ ঃ

শ্রমজীবী মানুষের জীবন মানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষা!

অসমের কয়লাখনিতে ৪ শ্রমিকের জলে ডুবে মৃত্যু

অসমের ডিমা হাসাও জেলার কয়লাখনিতে গত ৬ই জানুয়ারি কয়লা খাদান থেকে কয়লা তোলার সময় আচমকা জল ঢুকে পড়ায় ১৫ জন শ্রমিক আটকে পড়েন। একদিন পর উদ্ধার কাজ শুরু হয়। নৌবাহিনীর ডুবুরি, সেনাদল জল বার করতে ব্যর্থ হয়। কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয় এবং ৪ জন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মৃতদের এককালীন ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন।

উচ্চ অসমে অবস্থিত ডিমা হাসাও এবং পার্শ্ববর্তী মেঘালয় রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রচুর পরিমাণ কয়লা এবং চুনাপাথর আছে। এগুলি সবই সিমেন্ট কারখানা এবং তাপবিদ্যুৎ কারখানায় যায়। বাংলাদেশেও চালান হয়। এই অঞ্চলে সরকারিভাবে খনিজ উত্তোলনের দায়িত্ব রয়েছে অসম মিনারেল

ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের উপর। ঐ করপোরেশনের অব্যবহৃত বা পরিত্যাজ্য কয়লাখনিতে পুনরায় কয়লা উত্তোলনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করছে স্থানীয় স্বশাসিত কাউন্সিল নেতারা, শাসন ক্ষমতায় থাকা পার্টির নেতারা, প্রশাসনের আমলারাও এবং জমির মালিকরা। তাই একথা সুস্পষ্টভাবেই বলা যায় যে পুলিশ, আমলা, আদালত সকলেই এই 'অবৈধ' খনি সম্পর্কে অবহিত এবং ঐ খনিজ সম্পদের বিক্রির টাকার ভাগ পায়। এরপরও কি এগুলিকে 'অবৈধ' খনি বলা যায়?

এই খাদানগুলিকে 'র‍্যাট হোল' বা ইঁদুরের গর্ত বলা হয়। ২৫০-৩০০ ফুট কুয়োর নিচে নেমে তারপর হামা দিয়ে ঢুকতে হয় ঐ 'ইঁদুরের গর্তে'। এই গর্তগুলি উচ্চতায় ২-৩ মিটার। গাইতি ও বেলচা দিয়ে কয়লা কেটে ২০ কেজি কয়লা একটি ঠেলাগাড়িতে ভরে তা খনিমুখে টেনে আনা হয়। তারপর পুলি চেনের দ্বারা ক্রেনের সাহায্যে উপরে তোলা হয়। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত চলে খনন কাজ, এরপর বর্ষার জন্য খাদান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিপজ্জনক কাজ বলে এই কাজে শ্রমিকদের অন্য কাজের তুলনায় বেশি মজুরির (দৈনিক ১৫০০ টাকা) লোভ দেখানো হয়। ফলে দূর দূরান্ত থেকে জীবনের বাজি রেখে শ্রমিকরা কাজ করতে আসেন।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইবুনাল র‍্যাট হোল মাইনিংকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও এই খনন রমরম করে চলছে। মেঘালয় পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে ২০১৪-২০১৮ সময়কালে ৪৭৭ বার এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া হিল জেলার সান গ্রামে একইভাবে খনিতে জল ঢুকে ১৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সমীক্ষণে এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। বিচারপতি বি পি কাটাকে কমিটির (এপ্রিল ২০২২) এর রিপোর্টেও বলা হয় যে অবৈধ খাদান চালু আছে। পথে ঘাটে সর্বত্র উত্তোলিত কয়লা চালান হওয়া, স্তূপ করে রাখা এবং সিমেন্ট ও তাপবিদ্যুৎ কারখানা এমনকি বাংলাদেশে চালান হওয়া দেখেও আইনে এই অবৈজ্ঞানিক খনন কাজকে অবৈধ বলার কোন অর্থ হয় কি? এই অবৈধ সিন্ডিকেটের সঙ্গে সরকারও যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলাতেও সিন্ডিকেট রাজ একই কাজ করছে শ্রমিকদের জীবনের বিনিময়ে লক্ষ কোটি টাকার কারবার চলছে।

(সূত্র ঃ দ্য হিন্দু অনলাইন সংখ্যা ১৬/০১/২০২৫)

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মাটি চাপা পড়ে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকের ই সি এল'র ডালমিয়া কোলিয়ারি সংলগ্ন ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের পাইপ লাইন বসানোর কাজ করতে গিয়ে খনির দেওয়াল ধ্বসে পড়ায় মাটি চাপা পড়ে ৩ জন ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হয়। গত ২১শে জানুয়ারি সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃতরা হলেন রজ্জাক শেখ (২০), রোহিত শেখ (১৮) এবং নীতিশ পাসওয়ান।

[সূত্র ঃ হিন্দুস্থান টাইমস অনলাইন সংখ্যা ২১/০১/২৫]

হাওড়ায় ওয়াগন কারখানায় ব্যারেলে থেঁতলে ১ শ্রমিকের মৃত্যু

হাওড়া জেলায় সাঁতরাগাছি অঞ্চলে ওয়াগন তৈরির কারখানা হিন্দুস্থান ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। এই কারখানায় গত২৫শে জানুয়ারি ৩নং বে-তে তেল ট্যাঙ্কার গাড়ির ব্যারেল ক্রেনের মাধ্যমে সরানো হচ্ছিল। এই কাজে পুরো ব্যারেল লোহার চেইনে বেঁধে ক্রেন দিয়ে উত্তোলন করাই নিয়ম। মালিকের হুকুমে জলদি কাজ করতে শুধুমাত্র ইউক্রিপ টেগিং দিয়ে ওঠানো হয়। ক্রেন চলতে শুরু করে। কিছুদূর যাওয়ার পর সেই পাতলা টেগিং ভেঙ্গে অনতিদূরে কর্মরত শ্রমিকের উপর গিয়ে পড়ে। মাথা ও শরীর থেঁতলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়ন নেতাদের সহায়তায় ঠিকাদার মালিক লাশ পিছনের গেট দিয়ে পাচার করে দেয়।

মৃত ঠিকাদার সংস্থার অধীনে কর্মরত শ্রমিককে কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদার মালিক কিছু আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাতের ময়লা ঝেড়ে ফেলেছে।

মহারাষ্ট্রের অর্ডন্যান্স কারখানার বিস্ফোরণে ৮ শ্রমিকের মৃত্যু

গত ২৫শে জানুয়ারি ২০২৫, মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা জেলায় অবস্থিত অর্ডন্যান্স (অস্ত্র তৈরির) কারখানায় সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে লো টেমপারেচার প্লাসটিক এক্সপ্লোসিভ বিল্ডিং নং ২৩-এ বিস্ফোরণ হয়। এটি কারখানার হাই এনার্জি এক্সপ্লোসিভের অংশ। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কারখানার কাঠামো ভেঙে পড়ে। এই সময় কারখানায় ১৩ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিল। তৎক্ষণাৎ ৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, ৫ জন গুরুতর আহত হন।

ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে যে কেন বিস্ফোরণ ঘটল এবং ভবিষ্যতে এমন বিস্ফোরণ ঠেকাতে কি পদক্ষেপ নিতে হবে তার জন্য।

(সূত্র ঃ ইন্ডিয়া টুডে, ২৫/০১/২০২৪)

দুর্গাপুরে বিষাক্ত রাসায়নিক ভর্তি পুকুরে ডুবে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের পারুলিয়া এলাকায় গত ২৮শে জানুয়ারি এসার অয়েল সংস্থার ২৪২ নং মিথেন উত্তোলন কেন্দ্রে ১ জন ঠিকা শ্রমিক বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রিত পুকুরে ডুবে যায়। তাকে বাঁচাবার জন্য অপর ঠিকা শ্রমিকরাও রাসায়নিকে ডুবে যায়। ঘটনায় আকাশ খড়কর (২৫) এবং অনুপ সরকার (২৬) মারা যায়। বাকি ৩ শ্রমিককে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আকাশের বাড়ি জামবন এবং অনুপের বাড়ি মালদহ।

পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে প্রাকৃতিকভাবে জমা হওয়া বিষাক্ত রাসায়নিক মিথেন (তরলীভূত) উত্তোলনে এসার অয়েল কোম্পানি এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন কাজ করছে এবং এই তরল (কোল বেড মিথেন) উত্তোলন করে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। এই মিথেন বর্তমানে জ্বালানি (সিএনজি) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসার অয়েল সংস্থার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীরা দীর্ঘদিন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এলাকায় দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ তুললেও কোম্পানির বিরুদ্ধে সরকারের কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় নি। *(সূত্র ঃ বেঙ্গল মিরর, ২৮/১/২৫)*

বানতলা চর্মনগরীতে নিকাশী নালা পরিস্কার করতে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

গত ২রা ফেব্রুয়ারি বানতলার চর্মনগরীতে ম্যানেহোলে শ্রমিকদের নামানো হল উঠে আসা ট্যানারির বিষাক্ত জল বন্ধ করার জন্য। কোন রকম সুরক্ষা ছাড়াই প্রথমে ফরজেম শেখ (৬২), তারপর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সুমন সর্দার (৩২) এবং তারপর হাসিবুর রহমান (২৬) কে ম্যানহোলে নামান হল। বাকি শ্রমিকরা বিপদ বুঝে নামতে চান নি। এই ঠিকা শ্রমিকরা কেএমডিএ'র নিকাশি নালা তৈরির কাজ করছিলেন দৈনিক ৪০০ টাকা হাজিরায়।

৩ জন শ্রমিকের বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যুর পর বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানায় অক্সিজেন মাস্ক পরেও ১-১$^{১}/_{২}$ মিনিটের বেশি ম্যানহোলে থাকা যাচ্ছিল না। পুলিশ গাফিলতির জন্য একজন ঠিকাদারকে গ্রেপ্তার করেছে, সরকার মৃতদের জন্য ১০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে ব্যস!

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে হাতে করে পয়ঃপ্রণালীর কাজ এবং নিকাশি সম্পূর্ণ বে-আইনী। ২০১৩-২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই আইন সত্ত্বেও ৯৮৯ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সর্বত্র ঠিকেদার সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেছে কেএমডিএ সহ মূল সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তথা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আজও পদক্ষেপ নেয় নি।

বানতলার ঘটনার পরই গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কার করতে গিয়ে পুনরায় ২ শ্রমিকের মৃত্যু হল।

এই নিদারুন এবং অমানবিক কাজের অবসান কবে হবে?

[সূত্র ঃ অনলাইন আনন্দবাজার, ১০/০২/২০২৫]

তেলেঙ্গানায় সুরঙ্গে বিপর্যয়ে ৮ শ্রমিক আটক জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা ক্ষীণ

গত ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে আটটায় তেলেঙ্গানার শ্রীশৈলাম লেফট ব্যাঙ্ক ক্যানেল (এসএলবিসি) টানেল (নাগরকুরনুলে অবস্থিত) এর একটি অংশে ধ্বস নামে। এই এসএলবিসি হল বিশ্বের সর্ববৃহৎ সেচ টানেল। ৪৪ কিমি দীর্ঘ সুরঙ্গের সাড়ে ১৩ কি.মি. গভীরে বিপর্যয় ঘটে। উদ্ধারকার্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর এবং বিশেষ ধরনের রোবট ব্যবহার করা হয়। ১২টি উদ্ধারকারী দলের ৭০০ জন সদস্য কাজ করেও কাউকে উদ্ধার করা যায় নি। ৬ জন শ্রমিক এবং ২ জন ইঞ্জিনিয়ার আটক হয়ে আছেন। এঁরা হলেন ফনি সিং, গুরপ্রীত সিং, মনোজ কুমার, শ্রীনিবাস, সন্দীপ সাহও, সন্তোষ সাহু, অনুজ সাহু এবং জগৎ খেড়।

[সূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ২৭/০২/২০২৫]

কালনার হিমঘরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি কালনা-২ ব্লকের ভবানন্দপুর গ্রাম। এই গ্রামে অবস্থিত হিমঘরে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে ২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, অসুস্থ হন অনেক শ্রমিক। গ্যাসে সকলের চোখ মুখ জ্বলতে থাকে। প্রশাসনের তরফে বলা হয় হিমঘরের ২০০ মিটারের মধ্যে যে কেউ না আসেন।

[সূত্র ঃ এই সময় অনলাইন, ২৭/০২/২০২৫]

কল্যাণীতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ মৃত ৪ শ্রমিক

নদীয়া জেলার কল্যাণীতে রথতলায় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাজি কারখানায় গত ৭ই ফেব্রুয়ারি এক বিরাট বিস্ফোরণের আগুনে ঝলসে অন্তত ৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুতের তার সংযোগে সমস্যা থেকেই এই আগুন লাগে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান। বিস্ফোরণের ফলে কারখানার দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ে। *[সূত্র ঃ আনন্দবাজার অনলাইন ০৭/০২/২০২৫]*

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবেশবাদীরা জলবায়ু সম্মেলনের জন্য রাস্তা বানাতে আমাজনের জঙ্গল সাফ করল!

আমাজনের জঙ্গল কেটে পরিবেশ সম্মেলনের জন্য চার লেনের দীর্ঘ রাস্তার তৈরির কাজ চলছে।

ব্রাজিলের বেলেমে জলবায়ু সম্মেলন ২০২৫ (কপ ৩০) এর আয়োজন উপলক্ষ্যে সংরক্ষিত আমাজন জঙ্গলের কয়েক লক্ষ একর জঙ্গল (রেইন ফরেস্ট) কেটে সাফ করা হল চার লেনের হাইওয়ে প্রস্তুতির জন্য। এটা করা হয়েছে আগামী নভেম্বর ২০২৫-এ ব্রাজিলের বেলম-এ অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলন (কপ ৩০) এ ৫০ হাজার প্রতিনিধিদের শহরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা সুগম করতে। সরকার এই কর্মকান্ডকে পরিবেশ বান্ধব প্রমাণপত্র (sustainable credential) বলে উল্লেখ করলেও স্থানীয় মানুষ এবং পরিবেশবাদীদের অপর অংশ তার নিন্দা করেছে। তাদের মতে আমাজনের জঙ্গল বিশ্বের কার্বন শোষণের এবং জৈববৈচিত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কর্মকান্ড জলবায়ু সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্যের বিপরীত কার্যকলাপ।

ব্রাজিলের বেলম শহরে পৌঁছাতে নির্ণীয়মান এই চার লেনের হাইওয়ে আমাজনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১৩ কি.মি.-র (৮ মাইল) অধিক পথ পরিক্রমা করতে হবে। বর্তমানে এই রাস্তা বানাতে বড় বড় মেশিনের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ গাছকে উপড়ে ফেলা হচ্ছে।

ক্লডিও ভেরেমিউটে নামক এক ব্যক্তি যিনি ওই নির্ণীয়মান রাস্তার মাত্র ২২০ মিটার দূরে বাস করেন এবং যিনি ঐ জঙ্গলে আফাই বেরি (একরকম বেগুনি রঙের ফল যা পাম গাছ থেকে পাওয়া যায়) চাষ করে সংসার চালাতেন তিনি সংবাদ সংস্থা বিবিসি'কে বলেন "সমস্ত কিছুই ধ্বংস করা হয়েছে। আমাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। জমানো টাকায় সংসার চলছে।" তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন এই রাস্তা নির্মাণের পর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য জঙ্গল আরও কাটা হবে।

এই জঙ্গল কাটার ফলে জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারদের গতিবিধি সীমিত হবে, রাস্তার হাইস্পিড গাড়ির জন্য দুর্ঘটনা বাড়বে বলে পরিবেশ গবেষক প্রফেসর সিলভিয়া সারদিনহা মন্তব্য করেন।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট এবং পরিবেশ মন্ত্রী বলেন যে কপ ৩০ হবে এক ঐতিহাসিক সামিট কারণ এটা হল আমাজনে অনুষ্ঠিত কপ (কনফারেন্স অফ পার্টিজ বা পরিবেশ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্মেলন) আমাজনের জন্য কপ নয়। প্রেসিডেন্ট বলেন যে এই সভা আমাজনের গুরুত্বকে তুলে ধরার এক বিরাট সুযোগ। আমাদের কাছে সুযোগ এসেছে পৃথিবীর প্রধান অরণ্যকে ফেডারেল সরকার কিভাবে সংরক্ষিত রেখেছে তা বিশ্ববাসীকে জানানোর।

পরিবেশবিদ প্রফেসর সারদিনহা এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে সম্মেলনে অতি উচ্চস্তরের ব্যবসায়ী এবং সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে চর্চা হবে, যারা আমাজনের জঙ্গলে বসবাস করেন তাদের কথা সেখানে শোনা হবে না।

ব্রাজিলের ফেডারেল সরকার ৮১ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন=১০ লক্ষ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে বিমান বন্দরে ৭ থেকে ১৪ মিলিয়ন যাত্রীর পরিসেবার জন্য এবং একটি ৫ লক্ষ বর্গ কিমি সিটি পার্ক তৈরি করছে। অসংখ্য হোটেল, স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স

●*শেষাংশ ২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

সমাজ বিজ্ঞান ঃ

পিতৃতন্ত্র, শোষিতশ্রেণীর অন্যতম প্রতিপক্ষ

– তন্ময়

মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে অধিকাংশ সম্পদ আর অধিকাংশ মানুষের হাতে মুষ্টিমেয় সম্পদ, এই বৈপরীত্য দেখিয়ে দেয় যে, অসাম্য, বঞ্চনা, শোষণ মনুষ্য সমাজকে নাগপাশের মতো বন্দি করে রেখেছে। যে সমাজে অসাম্য বিরাজ করে সেই সমাজে স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার অধিকার, আত্মসম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অধিকার সকলের জন্য সমান হয় না। এই সকল অধিকার শোষিত শ্রেণীর জন্য নয়, শাসকশ্রেণীর জন্য সুরক্ষিত হয়। যে সমাজে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বঞ্চনার শিকার সেই সমাজ সমানাধিকার বিরোধী। মানব সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য না থাকলে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সামাজিক বৈষম্যের পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ নারী উভয়ই শোষণের শিকার। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে এই ব্যবস্থায় নারী সমাজ অধিক অবহেলিত। তাই মানব সভ্যতার বিকাশের স্বার্থে, মহিলাদের সুরক্ষার দাবিতে, পথে-ঘাটে-কর্মস্থলে সুযোগ সুবিধার দাবিতে, সর্বোপরি সমানাধিকারের দাবিতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে একত্র হয়ে লড়াই সংগ্রাম করা জরুরী। বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন পুরুষদের নিজেদের প্রতিপক্ষ ভেবে নিয়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করেন এবং সমাধানের পথ খুঁজতে সচেষ্ট হন। যা পিতৃতন্ত্র থেকে উদ্ভুত সমস্যার প্রকৃত উৎস ও সমাধানের অনুসন্ধানের বিজ্ঞানসম্মত পথ নয়। সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস চর্চা না করে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎস খোঁজা অবৈজ্ঞানিক। এর ফলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসত্য ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে এই ব্যবস্থার কার্যকারণ সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা অবশ্যম্ভাবী।

সমাজের সূচনা থেকেই নারীরা পুরুষের দাসী ছিল একথা ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এই সমাজব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার লেশমাত্র ছিল না। এমনকি যাযাবর সমাজের পরিবারের উৎপত্তি সময়কালেও পারিবারিক গোষ্ঠীর কেন্দ্রে ছিল নারীজাতি। আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের হাত ধরেই এলো নতুন ব্যবস্থা। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন এবং সমাজ ও পরিবারের বিবর্তনের হাত ধরে পিতৃতন্ত্রের প্রবেশ।

মনুষ্য সমাজের স্তরবিন্যাস করলে বন্যাবস্থা, বর্বরতা আর সভ্যতা মানবজাতির এই তিনটি যুগ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়।

বন্যাবস্থার নিম্নতম স্তরে জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে গ্রীষ্ম ও উপগ্রীষ্ম মন্ডলে মানুষ সাধারণত গাছে বসবাস করতেন। তারা বন্য পশুর মতো জীবনের উপকরণগুলো সংগ্রহ আর প্রধানত গাছের ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতেন। পৃথকোচ্চারিত ভাষায় নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করতেন। পশুজগৎ থেকে মানুষের রূপান্তরিত হওয়ার উৎক্রমণমীল এই স্তরে পরিবার ছিল এক রক্ত সম্পর্কের। এটাই পরিবারের প্রথম স্তর, যেখনে যৌন সম্পর্ক ছিল অবাধ। বন্যাবস্থার মধ্যবর্তী পর্যায়ে পূর্ববর্তী স্তর থেকে ভিন্ন নানান পরিবর্তন ঘটল। এই সময় মানুষ পাথরের অস্ত্র আবিষ্কার, পাথর ঘষে আগুন তৈরির শিক্ষা অর্জন করলেন। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত শুরু করলেন। বিশেষত তারা ছিলেন সমুদ্র উপকূল ধরে পরিভ্রমণকারী। উদ্ভব হল যাযাবর সমাজের। ফলমূলের সাথে খাদ্য তালিকায় যুক্ত হল মাছ সহ জলজ এবং অন্যান্য প্রাণীর পোড়া মাংস। যেহেতু তখনো উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু হয়নি সেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর বেঁচে থাকার উপায়ের গুণাত্মক পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে খাদ্য সংকট দেখা দিতে লাগল। সমাজের এই স্তরে পারিবারিক সংস্কৃতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

পারিবারিক সংস্কৃতি ও যৌন সম্পর্কের নিয়মকানুনের পরিবর্তন ঘটল বন্যাবস্থার উচ্চতম স্তরে। এক রক্ত সম্পর্কের পরিবার থেকে এল পুনালুয়া পরিবার। **'পুনালুয়া'** শব্দটির অর্থ

'ঘনিষ্ঠ সাথী'। একাধিক বিচ্ছিন্ন সঙ্গীর পরিবর্তে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী অবাধ যৌন সম্পর্ক রইল না। সহোদর ভাইবোনেদের সাথে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হতে শুরু করল। প্রথমে মায়ের দিক থেকে সহোদর ভাইবোনেদের সাথে, পরে সব সম্পর্কের সকল ভাইবোনদের মধ্যেই বিবাহ বন্ধ হল। পরিবারের যৌন সম্পর্কের এই পরিবর্তন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সংকেটর কারণে প্রয়োজন হয়েছিল। কাঠ ও তক্তা দিয়ে বাসস্থান তৈরি, গাছের বাকল থেকে পোশাক তৈরি, তীর ধনুক ছিলার হাতিয়ার আবিষ্কার, ঘষামাজা পাথরের অস্ত্রের ব্যবহার, কাঠের পাত্র, বাসন-কোসন ঝুড়ি চুপড়ি থেকে শুরু করে জলে ভেসে থাকা ডোঙা তৈরি এই স্তরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

বন্যাবস্থার উচ্চতম স্তরের পরে এল বর্বরতা যুগের নিম্নতম স্তর। এই সময় মৃৎ শিল্পের উদ্ভব ঘটে। এরপর বর্বতার মধ্যবর্তী স্তরে রোদে শুকনো মাটির ইটের ব্যবহার করে গৃহ নির্মাণ, পশুপালন ও কৃষির আবিষ্কারের ফলে তৎকালীন সমাজে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে থাকে। পরিবর্তন ঘটে পারিবারিক সম্পর্কেরও। পুনালুয়া পরিবারের সময়কালে বিবাহের এই নিষেধাজ্ঞার ক্রমবর্ধিত জটিলতা সমষ্টি বিবাহকে ক্রমেই অসম্ভব করে তোলে। উদ্ভব হয় **জোর বাঁধা** পরিবার। পরিবারের এই পর্যায়ে একজন পুরুষ একটি মাত্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসবাস করা শুরু করে। তবে পরিবারের এই নিয়মের বাঁধন পুরুষদের ক্ষেত্রে ছিল না। তাদের মধ্যে বিশ্বাস ভঙ্গের এবং বহু পত্নী সাহচর্যের অধিকার থেকে যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে এই নিয়ম লাগু হয়। পতিব্রত থেকে বিচ্যুত হয়ে সামান্যতম ব্যভিচার হয়েছে মনে করলে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর ভেদাভেদ অর্থাৎ স্ত্রী জাতির ওপর পুরুষদের আধিপত্য এই সময় থেকেই শুরু হয়। যদিও এই সময় বৈবাহিক সম্পর্ক যে কোন পক্ষ থেকে সহজেই ভেঙে দেওয়া যেত এবং সন্তান-সন্ততিরা আগের মত মায়ের অধিকারভুক্ত থাকতো। অর্থাৎ পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার তখনও কায়েম হয়নি। নারী হরণ ও নারী ক্রয় বিক্রয় এই সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

বর্বরতার উচ্চতম স্তরে লৌহ আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশন, গবাদি পশু চালিত লাঙ্গল ব্যবহার থেকে শুরু করে বিকশিত ধাতুর কাজের শিল্পকলায় উত্তরণ, শিল্প হিসেবে স্থাপত্যের সূচনা, মিনার দেওয়াল সমন্বিত প্রাচীর বেষ্টিত নগর তৈরির মধ্য দিয়ে সভ্যতার ঊষা লগ্নে পা রাখল মনুষ্য জাতি।

জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পর্যায়কালে আদিম সাম্যবাদী সমাজের অবলুপ্তির লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে। পশুপালন ও কৃষির প্রচলনের ফলে অপ্রত্যাশিত সম্পদের উদ্ভবের কারণে নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস তৈরি হয়। এই সম্পদ প্রথমে গোত্রের অধীনে ছিল। এই ধরনের সম্পদ যখন পারিবারিক মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হল এবং সেই সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধি হতে থাকল তখন জোড় বাঁধা পরিবার ও মাতৃ অধিকার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কঠোর আঘাতের মুখোমুখি হল। সম্পদের পরিমাণগত বৃদ্ধির সাথে সাথে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল। স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করল। কর্তৃত্বের ক্ষমতায়নের ফলে সমাজে পুরুষের অবস্থান শক্তিশালী হয়ে উঠল। সেই ক্ষমতার কারণেই সন্তান-সন্ততির উত্তরাধিকার মায়ের দিক থেকে হরণ করে পিতার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হল। উদ্ভব হল এক **পতি পত্নী** পরিবারের। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সদ্ভাব, ব্যক্তিগত যৌন প্রেম বা বিবাহের উচ্চতম রূপ হিসেবে নয়, এক পতি পত্নী পরিবারের উদ্ভব হয়েছিল সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর নিশ্চয়তা এবং পরিবারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে শোষিত, বঞ্চিত নারীদের অনেকেই এই সময়কালে গণিকা বৃত্তি করতে বাধ্য হল। গণিকা বিলাসী পুরুষেরা সমাজে নিন্দিত হলেন না, নিন্দাবাদ (হেটায়ারিজম) আঘাত করল গণিকা বৃত্তি করতে বাধ্য হওয়া স্ত্রী লোকদের। তারা সামাজিক বয়কটের শিকার হয়ে সমাজচ্যুত হয়ে পড়লেন। এটাও স্ত্রীলোকের ওপর পুরুষের চরম আধিপত্যের আরেকটা প্রমাণ। এই গণিকা বৃত্তির পেশা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় আজও বহমান।

বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তর থেকে উচ্চতম পর্যায়ের ক্রমোন্নতির সময়তে দাস ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। দাসেরা ছিল শোষিত আর দাসেদের প্রভুরা ছিল শোষক। 'শোষক' ও 'শোষিত' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল মানব সমাজ। আদিম যাযাবরেরা জীবন জীবিকার তাগিদে খাদ্য সংগ্রহ করতেন। খাদ্য সংগ্রহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় যখন খাদ্যের অভাব দেখা দিল তখন খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। শুরু হল উৎপাদন। খাদ্য সংগ্রাহক খাদ্যের প্রয়োজনে পরিণত হল খাদ্য উৎপাদকে। বন্য পশুকে নিজেদের বশে আনতে শিখল। বন্য পশুকে অধীনস্ত করার জন্য দৈহিক শ্রমশক্তির ফলস্বরূপ উৎপাদনী ব্যবস্থা পুরুষদের কব্জাগত হল। পশু পালনের জন্য অনেকের প্রয়োজন হতো। যুদ্ধ বন্দীদের এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হতো। নারীজাতি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে অপসারিত হল। পশুপালন এবং কৃষির বিকাশের ফলে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত ভোগদখলের জন্য জন্ম হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির। সম্পদ বৃদ্ধির

লক্ষ্যে অন্য গোষ্ঠীকে আক্রমণ এবং দখলীকৃত সম্পদ রক্ষায় অন্য গোষ্ঠীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পুরুষদের বাহুবলের আবশ্যকতা দেখা দিল। বৃদ্ধি হল পুরুষ আধিপত্যের। স্থায়ী সম্পদ সংরক্ষণ এবং বংশানুক্রমে সেই সম্পদ ভোগদখলের জন্য নারীদের স্থান হল অন্তঃপুরে। মূলত সন্তান প্রজনন, পালন পালন এবং পরিবারের গৃহস্থালির কাজে আবদ্ধ হয়ে পড়ল নারী সমাজ। মানুষের ইতিহাসে দেখা দিল প্রথম শ্রেণীবিভাগ। যার একদিকে পুরুষ আর অপরদিকে নারী। **কার্ল মার্কস সম্পত্তির মালিকানাকে পরিবারের মধ্যে সুপ্ত দাসত্বের জন্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।** এইভাবে বর্বরতার নিম্নতম স্তর থেকে সভ্যতার স্তরে সামাজিক অগ্রগমনের পথে জোড় বাঁধা পরিবার থেকে এক পতি পত্নী পরিবারে উত্তীর্ণ হওয়ার সময়কালে উৎপাদিক শক্তির বিকাশ, জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃদ্ধি, সম্পদের উপর অধিকারের চরিত্র বদলের কারণে সৃষ্টি হল **'পিতৃতন্ত্র'**।

পিতৃতান্ত্রিকতা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীজাতির ওপর আধিপত্যবাদ কায়েমের স্বার্থে ক্ষমতাশীল পুরুষদের দ্বারা সৃষ্ট একটি সামাজিক ব্যবস্থা। পরিবারের কর্তা পুরুষদের দ্বারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিশেষ করে মহিলাদের শাসন ও শোষণের এবং বংশ পরম্পরায় পুরুষ আধিপত্য বজায় রাখার একটি গণতন্ত্রহীন শোষণ মূলক প্রথা। দাস সমাজে যার উৎপত্তি, সামন্ত সমাজে যার বিস্তার, বর্তমানে পুঁজিবাদের যুগে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটলেও মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই প্রথা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। দাস ও সামন্ত যুগে নারীরা ছিল উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। এইসময় শুধুমাত্র পারিবারিকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো নারীরাও যুক্ত থাকত। যদিও তার বিনিময়ে কোনও পারিশ্রমিক পেত না। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি বৃদ্ধি ও অধিক মুনাফা অর্জনের স্বার্থে পিতৃতান্ত্রিক রাশ একটু শিথিল করা হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় নারী জাতি। পুঁজি বৃদ্ধি হয় শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ ক'রে। তাই এই সমাজে শ্রমিক তথা শ্রমজীবী শ্রেণী শ্রমের মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। মজুরি হিসেবে যা পায় তা হল শ্রমশক্তির মূল্য। শ্রম আর শ্রমশক্তি এক নয়। শ্রমশক্তির মুল্য হল শ্রমের জন্য যে শক্তি ক্ষয় হয় তা পুনরুৎপাদনের জন্য ন্যূনতম মজুরি। যা না দিলে একজন শ্রমিক শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অটোমেশন অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। যন্ত্র কায়িক শ্রম লাঘব করে। কায়িক শ্রম হ্রাস পাওয়ায় পুঁজিপতিরা পুরুষ শ্রমিকদের থেকে কম মজুরিতে নারী ও শিশুদের অনেক কাজে নিযুক্ত করেন। এভাবেই পুঁজি বৃদ্ধির স্বার্থে পুরুষ ও নারীর বৈষম্যের মধ্য দিয়ে পিতৃতন্ত্র টিকে থাকে।

ইভটিজিং, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, নারী পাচার ইত্যাদি নারী অবমাননার সংস্কৃতি পিতৃতন্ত্রের অবদান। এই ব্যবস্থা নারী সমাজকে নারী সুরক্ষার নামে একপ্রকার পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেধে রাখে। মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে তাদের চিন্তাভাবনা, পোশাক-আশাক, চলাফেরা সহ প্রায় সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। বোরখা, ঘোমটা ইত্যাদি পর্দানসীন প্রথা চালু করে। বর্তমানে পুঁজিবাদের যুগে সেই ব্যবস্থাই অর্ধনগ্ন বা প্রায় উলঙ্গ নারী দেহকে পণ্যের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা সহ পর্ণোগ্রাফি বা নীল ছবির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্য চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। পরিবারের চালিকাশক্তির হাতে নিষ্পেষিত হয় স্বাধীনতা। ফলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়। শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য প্রগতি ও গণতন্ত্রের বিরোধী। এই স্বৈরাচারী এবং প্রতারণামূলক ব্যবস্থা মানবিক সাম্যের অন্তরায়। পিতৃতান্ত্রিকতার ভিত যত শক্ত হয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক হিংসার আধিক্য তত বৃদ্ধি পায়। সদস্যের একজন কোনটা পছন্দ, কোনটা অপছন্দ সেটা নিঃসংকোচে প্রকাশ করা তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। পরিবারের কর্তা বা অন্যান্য গুরুজনদের আধিপত্যবাদ সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। পিতৃতান্ত্রিকতা এমন একটা হিংসার সংস্কৃতির জন্ম দেয় যা পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে মর্যাদার সমানাধিকার লঙ্ঘন করে। আর্থসামাজিক নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিক শোষণের জন্য শুধুমাত্র পুরুষরা দায়ী নয়, এর অনুশীলন চলে মহিলাদের মধ্যেও। এবং পিতৃতন্ত্রের শিকার শুধু নারীরা নয়, পুরুষেরাও এর শিকার হন।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতা সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পিতৃতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতার অধিকার অর্জনের সংগ্রামের সামনে প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর গড়ে তোলে। মানুষের চিন্তাশক্তিকে ক্রমান্বয়ে ভোঁতা করে তোলে। যার ফলে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচ্যুতি বা শিথিলতা দেখা দেয় এবং অনেক সিদ্ধান্তই ভুল সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হয়। ভোঁতা অস্ত্র কখনোই মানবজীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা দাসত্বের শেকল থেকে ছিন্নভিন্ন করে মুক্তির স্বাদ এনে দিতে পারে না। যে সমাজে মানুষের মুক্তি

নেই সেই সমাজে মানুষের মূল্য থাকতে পারে না। জীবনের প্রতিটি সমস্যায় হতোদ্যম হয়ে না পড়ে লড়াই করার শক্তি যোগায় বৈজ্ঞানিক মেজাজ। বিজ্ঞানের মনন ভাবতে শেখায়, ভাবাতে শেখায়। মনুষ্য জীবনের দৈনন্দিন নানা সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে ও নিরসন করতে সচেষ্ট করে। যেহেতু বিজ্ঞানমনস্কতার পথ যুক্তি ও বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে সকল বস্তু ও ঘটনাপ্রবাহের নির্মোহ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জীবনযাপনের বস্তুনিষ্ঠ পথ, তাই পিতৃতন্ত্রের সাথে বিজ্ঞানমনস্কতার স্বাভাবিক বিরোধ। বিজ্ঞানমনস্কতা নিজে যেমন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্ম দেয় ঠিক তেমনি গণতান্ত্রিক পরিসর ছাড়া বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার হয় না।

মনুষ্য জাতির মধ্যে নারী পুরুষ ভেদাভেদ সহ কোন ভেদাভেদ কাম্য নয়। গণতান্ত্রিক বাতাবরণে সকলের মেধা ও মননের উত্তরণ ঘটলে মানব সমাজের সার্বিক ঐক্য ঘটতে পারে। বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার জন্য শোষিত মানুষের মধ্যে এই সার্বিক ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ। পিতৃতান্ত্রিকতা এই ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা যেহেতু কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা, ক্ষমতার প্রদর্শন ও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার মানসিকতা তাই এই ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তির অধিকার হরণ করা হয়। প্রতি পদে পদে মানুষের মুক্তির সংগ্রাম বাধা প্রাপ্ত হয়। এভাবেই পিতৃতন্ত্র হয়ে ওঠে 'শোষিতশ্রেণীর' অন্যতম 'প্রতিপক্ষ'।

যেহেতু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পিতৃতন্ত্রের জন্ম এবং শ্রেণী শোষণের অন্যতম উপায় পিতৃতন্ত্র তাই শ্রেণী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। যারা মনে করেন সামাজিক কাঠামোর ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই পিতৃতন্ত্রের সমস্যার সমাধান সম্ভব তারা সচেতন বা অচেতনভাবে পিতৃতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে চান। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে দাস, সামন্ত, বুর্জোয়া প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন রূপে প্রভু-অধীন সম্পর্ক বজায় রয়েছে। শোষণের কৌশলের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী সমাজের তুলনায় সমাজ সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রভু অধীন সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্ক থেকে মুক্তি হয় নি। এটা স্মরণে রাখা দরকার যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষ উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন। এই উৎপাদনী ব্যবস্থায় শ্রমের যোগান অব্যহত রাখার জন্য শ্রমিক তথা শ্রমজীবী মানুষের শ্রম বিক্রয় করা ব্যতীত বেঁচে থাকার কোনও উপায় থাকে না। পুঁজিবাদের মধ্যে যারা মুক্তি খোঁজেন তাদের চিন্তাধারার বিরোধিতা করে মার্কস বলেছিলেন, **"পুঁজিবাদে শ্রমিক দুভাগে মুক্ত। তার প্রথম মুক্তি হল নিজের শ্রমশক্তির বিক্রি করার করার স্বাধীনতা এবং দ্বিতীয় মুক্তি হল সে সমস্ত ধরনের উৎপাদনের উপকরণ থেকে মুক্ত।"** তাই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক, মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারা অধিকাংশ মানুষের শোষণ প্রক্রিয়ার বৃহত্তর রাজনৈতিক অর্থনীতিকে বিচার-বিশ্লেষণের বাইরে রেখে পিতৃতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজা অবৈজ্ঞানিক। এটা অনস্বীকার্য যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা অধিক অবহেলিত তবে এটাও সত্য যে এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র নারীর প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণ নয়। সামগ্রিকভাবে মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের প্রতি চূড়ান্ত বৈষম্যের শোষণমুলক ব্যবস্থা। তাই শুধুমাত্র পুরুষের দ্বারাই নারীর শোষণ হয় এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে নারীর ক্ষমতায়নমুখী দাবিদাওয়া ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে হবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে হলে শুধুমাত্র নারী সমাজকে নয়, সকল শোষিত মানুষকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুক্ত করতে হবে। শ্রেণীসংগ্রাম যেহেতু শোষণ মুক্তির সংগ্রাম সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক বিরোধী চরিত্র বর্তমান। তাই সর্বসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজের প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র করে তোলা পিতৃতন্ত্রের থেকে মুক্তির বিজ্ঞানসম্মত পথ। পিতৃতন্ত্রকে উচ্ছেদ না করে শুধু নারী নয়, সার্বিকভাবে মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। ■

●*পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান*

গড়ে তুলছে জলবায়ু রক্ষার আসন্ন অভিযানের জন্য! [সূত্র ঃ বিবিসি অনলাইন ১২/০৩/২০২৫]

এই সামগ্রিক কর্মকান্ড আরও একবার দেখিয়ে দেয় তথাকথিত জলবায়ু পরিবর্তন – বিশ্ব উষ্ণায়ন ঠেকাতে, জৈব বৈচিত্র রক্ষা করতে বিশ্বের রাষ্ট্রনায়ক, শিল্পপতিকূল এবং পরিবেশবাদী কর্তাদের কত আকূলতা! কপ নামক পরিবেশ সম্মেলন হয়ে চলেছে প্রতিবছর। এখানে পরিবেশ রক্ষার নাম করে ব্যবসায়িক চুক্তি হয় আর নেতা-মন্ত্রী-আমলা-শিল্পপতিদের জনগণের পয়সায় মোচ্ছব হয়। সকলের আবদার মেনে এবছর আমাজনের গভীর জঙ্গল ভ্রমণের ব্যবস্থা হবে। এই হল পরিবেশ রক্ষার নামে পরিবেশবিদদের কার্যকলাপের স্বরূপ! ■

অতিথি কলম ঃ

জিওর্দানো ব্রুনো, বর্তমান সময় ও আগামী পৃথিবী

– শান্তনু ব্রহ্ম

১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ইতালির নেপলস্ শহরের নোলা নামক এক জায়গায় জন্ম হয় ফিলিপ্পোর। তাঁর বাবা জিওভান্নি ব্রুনো পেশায় ছিলেন একজন সৈনিক। ফিলিপ্পোর জন্মের সময়টা এমন ছিল যখন মধ্যযুগের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতারও অবসান ঘটেনি আবার যুক্তিনির্ভর আধুনিক যুগেরও সূচনা হয়নি। ইউরোপের নবজাগরণ ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনও রোমান চার্চের বিচার ব্যবস্থাকে খর্ব করতে পারেনি। পোপতান্ত্রিক এই সমাজব্যবস্থায় ধর্মযাজকের পদটি সবচেয়ে সম্মানজনক ছিল। এসব কথা ভেবেই ১৭ বছর বয়সে ফিলিপ্পো নেপলসের সেন্ট ডমিনিকান কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং সাত বছর ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করে তিনি সেখানকার পাদ্রী হয়ে যান। পাদ্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় জিওর্দানো।

মূলত ধর্মযাজক হিসাবে পরিচিতি থাকলেও একাধারে তিনি দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও স্মৃতিবর্ধক পদ্ধতির একজন প্রণেতা হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে তিনি বক্তৃতা দিতে থাকেন নানা বিষয়ে। সেখানে যেমন ধর্মতত্ত্ব থাকতো, তেমনি থাকতো তাঁর মহাবিশ্ব চেতনার প্রকাশও। এমনই ছিল তাঁর গুণ যে ধনকুবের থেকে বিজ্ঞানী প্রত্যেকেই মুগ্ধ হয়ে যেত তাঁর বক্তব্য শুনে! ব্রুনো বিশ্বজগতের বহুত্বের ধারণাটির সঙ্গে রেমন্ড লালের অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ভাবধারার মিশ্রণ ঘটান। তিনি ছিলেন অতিরিক্ত ঠোঁটকাটা। পুরোহিততন্ত্রের রক্তচক্ষুকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। ক্যাথলিক চার্চ অ্যারিস্টটলিয় বিশ্বতত্ত্বকেই মেনে নিয়েছিল যা টলেমীর হাত ধরে রাজত্ব করেছিল প্রায় দুহাজার বছর! সেই মহাবিশ্ব ছিল এক বদ্ধ ফাঁপা গোলক যার কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। গোলকের গায়ে লেগে আছে তারাগুলো। আর এই সম্পূর্ণ গোলকটাকে ঘোরাচ্ছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। কিন্তু ব্রুনোর বিশ্বচেতনা মানতে পারেনি এই আবদ্ধ বিশ্বতত্ত্বকে। তিনি বললেন এই বিশ্বব্রহ্মান্ড অসীম, পৃথিবী গোল, সূর্য এই মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। এটি একটি নক্ষত্র ছাড়া কিছুই নয় এবং পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তাঁর পূর্বসূরি কোপারনিকাস আগেই সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে বলে বেড়াবার মতো দুঃসাহস তাঁর ছিল না! কোপারনিকাসকে সমর্থন করে সেই দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন ব্রুনো। আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন – কোনো গোলক নয়, বিশ্বের কোনো সীমা নেই। কোনো কেন্দ্রও নেই। সৌরমন্ডলের মতো এরকম গ্রহের পরিবার অসংখ্য আছে এবং তাতে প্রাণও থাকতে পারে! একে একে প্রকাশিত হয় মহাশূন্য নিয়ে তাঁর লেখা – La Cena de le Ceneri (The Ash Wednesday Supper, 1584), De Le Cause Principio at Uno (On Cause Principle and Unity, 1584) বইগুলো অত্যন্ত সাড়া ফেলেছিল! যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা বিপ্লবী ধ্যানধারণা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি কাছের মানুষদের কাছেও অপ্রিয় হতে থাকলেন। তাঁর লেখাগুলো ল্যাটিন ভাষায়ও অনুদিত হতে থাকে। ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতালিতে ফিরে এলে জিওভান্নি মচেনিগো নামের এক ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ আনেন। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে ২২শে মে তাঁকে ভেনেসিও ইনকুইজিশনের মুখোমুখি আনা হয়। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে রোমে পাঠানো হয় এবং সাত বছর ধরে বিচারকার্য চালানোর পর তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আনা হয় তা হল – ১) ক্যাথলিক ধর্মসহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ। ২) খ্রীস্টীয় ত্রিতত্ত্ববাদ, যীশুর মৃত্যু ও তাঁর পুনরুত্থান (resurrection) কে অস্বীকার করা। ৩) যীশু ও মাতা মেরীকে যথাযথ সম্মান না করা। ৪) এই

মহাবিশ্ব অসীম, সূর্য একটি নক্ষত্র এবং ইহা মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়; এধরনের মত পোষণ করা।

ইনকুইজিটর কার্ডিনাল বেলারমাইন ব্রুনোকে তাঁর ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে বলেন। ব্রুনো তা অস্বীকার করায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী পোপ অষ্টম ক্লেমেন্ট ব্রুনোকে একজন ধর্মদ্রোহী হিসাবে মৃত্যুদন্ড দেন। রায় শুনে ব্রুনো বলেন – "আপনারা হয়তো আমার সাথে হেরে যাবার ভয়ে এই রায় দিয়েছেন। আমি এটি গ্রহণ করলাম।" ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে রোমের কেন্দ্রীয় বাজারে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে খুঁটির সাথে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁর দেহভস্ম এরপর টাইবার নদীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্রুনো এই স্বাধীনতা বরণ করেছিলেন চিন্তার স্বাধীনতার সপক্ষে, বিজ্ঞানের সপক্ষে নয়! তিনি কোনো পরীক্ষা করেননি, কোনো পর্যবেক্ষণ করেননি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের তথ্যাবলী থেকে আপন পছন্দমত সিদ্ধান্ত বেছে নেবার অধিকারের কথা ঘোষণা করে গেছেন। ব্রুনো কোপারনিকাসের তত্ত্ব নিয়ে ভাবতে ও তর্ক করতে বাধ্য করেন। এইবার জোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহ নক্ষত্রপথের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দিলেন এবং ধীরে ধীরে ব্রুনোর মতগুলো প্রতিষ্ঠা পেতে থাকলো।

ইতিহাসবিদদের যুগ বিভাজন অনুসারে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে ভ্যান্ডাল নামের এক বর্বর জার্মান জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলে মধ্যযুগের সূচনা হয় এবং তা চলে কলম্বাসের আমেরিকা (নিউ ওয়ার্ল্ড) আবিষ্কার (১৪৯২) পর্যন্ত অর্থাৎ নবজাগরণের আগে পর্যন্ত। এই সময়কালের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় ইতিহাস বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। জার্মান রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা, সেন্ট অগাস্টিন প্রভৃতি পোপ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মের প্রসার, বিধর্মী বর্বর ভাইকিং, ম্যাগিয়ার, স্যারাসেন কর্তৃক লুঠতরাজ, পোপতন্ত্রের উত্থান, সামন্ততন্ত্র, কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর পন্ডিতদের সেখান থেকে পুথি-পত্র নিয়ে পালিয়ে এসে ক্লাসিকাল গ্রীস ও রোমান সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের পরিচয় ঘটানো, নবজাগরণের সূচনা, ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও প্রোটেস্টেন্ট ধর্মমতের সৃষ্টি – এই প্রায় পুরো সময়টায় ইউরোপীয় সমাজ রোমান চার্চ দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। চার্চ ও শাসক একত্রীভূত হয়ে রাষ্ট্র চালাতো। অপরাধীদের শাস্তি হতো ধর্মীয় আদালতে (ইনকুইজিশান)। এই বিচার ব্যবস্থা নিরঙ্কুশ ছিল। অপরাধীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ ছিল না। চার্চের সামান্যতম বিরোধিতা করলেই ধর্মীয় আদালতে তাঁর বিচার হতো এবং কঠোর শাস্তি পেতে হতো। সমকামীদের খুঁজে বের করে হত্যা করা হতো। সমকামী না হলেও সমকামী হিসাবে দাগিয়ে দিয়ে ইচ্ছামতো হত্যা করা হতো। পেগান বা অখ্রীষ্টানদের উপর নিপীড়ন চালানো হতো। ক্রাইস্ট কিলার হিসাবে ইহুদিদের হত্যা করা হতো। ১৩৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে যে ব্ল্যাক ডেথ বা প্লেগ মহামারী হয়েছিল তার জন্য দায়ী করা হয়েছিল ইহুদিদের – তাঁরা নাকি পানীয় জলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। কেউ কেউ প্রচার করেছিল যে খৃষ্টধর্মকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদিরা এই রোগ ছড়াচ্ছে। এই কারণে ইহুদিদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল খ্রীস্টানরা। ব্ল্যাক ডেথের দুইশো বছর পরও মাঝে মাঝে প্লেগ দেখা দিতো, তবে তাঁর প্রকোপ ছিল কম। ফলে প্লেগ সংক্রান্ত একটা আতঙ্ক রয়ে গেছিল মানুষের মনে। অনেকে মনে করতো অশুভ শক্তির প্রভাবে এই রোগ ছড়াচ্ছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এই ধারণা থেকেই শুরু হয় উইচ হান্টিং, যার শিকার হতো প্রধানত ইহুদি মেয়েরা। হিসাব অনুযায়ী ঐসময় অন্ততপক্ষে নব্বই হাজার মানুষকে ডাইনি হওয়ার অপরাধে পুড়িয়ে মারা হয় ইউরোপে। সুতরাং পঞ্চম থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসে ধর্মীয় শোষণ এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এই শোষণ সম্ভব হয়েছিল রাজানুগত্যের মাধ্যমে। রোমান চার্চ যে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের শোষণ করতো তা নয়, ধনীরাও ধর্মীয় শোষণ থেকে রেহাই পেত না। পোপ তথাকথিত পাপীদের উদ্দেশ্যে মার্জনা পত্র ও স্বর্গে যাওয়ার টিকিট বিক্রি করতো এবং ধনীরা তা চড়া দামে কিনতো পাপমুক্তির আশায়।

এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ঘটে গেছে এক বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাস্তিল দুর্গের পতনের মাধ্যমে যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান হয় তাকে ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। এই বিপ্লবের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা লাভ এবং চার্চ ও স্টেট পৃথকীকরণ। এরপর থেকে চার্চ ও স্টেট কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলায় নি। ফরাসী বিপ্লব নিঃসন্দেহে ইউরোপের ইতিহাসে এক বিশেষ মাইলফলক। ইউরোপে প্রকৃত যুক্তিবাদের সূচনা হয় ঠিক এই সময় রুশো, ভলতেয়ার, মন্তেস্কুর হাত ধরে। পরবর্তীতে কান্ট, হেগেল, মার্কস-এঙ্গেলসের মাধ্যমে তা অন্য মাত্রা পায়। নতুন এক মতবাদের সৃষ্টি হয় – বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ।

ভারতের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতে বৈদিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ, পশুবলিকে অপ্রাসঙ্গিক ও ভন্ডামি মনে করে একশ্রেণীর মানুষ পুরোহিত শ্রেণীকে যুক্তির আঘাতে জর্জরিত করতো। চার্বাক ও আজিবিক দর্শন এভাবেই গড়ে উঠেছিল। এইসব দর্শন সংক্রান্ত নথিপত্র পরবর্তীতে আর পাওয়া যায় নি। পন্ডিতরা মনে করেন এদের হত্যা করার সাথে সাথে পুঁথিপত্রও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যুক্তিবাদী দর্শনগুলো বেঁচে আছে তৎকালীন শাস্ত্রকারদের নিন্দা ও সমালোচনার মাধ্যমে। এরপর আর যুক্তিবাদের চর্চা তেমন দেখা যায় না। সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যায় অভূতপূর্ব অবদানের জন্য যে গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ বলা হয়, আদতে তাও ছিল প্রচন্ড ধর্মকেন্দ্রিক এবং কঠোর জাতিভেদ প্রথার নাগপাশে আবদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি, কাত্যায়ন স্মৃতি ও বিভিন্ন পুরাণ এইসময় রচিত হয়। কঠোর বর্ণবাদ ও তীব্র নারীবিদ্বেষের ধারক মনুসংহিতাও নাকি এই সময় রচিত হয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা।

এরপর উনবিংশ শতকে এসে আমরা দেখতে পাই যুক্তিবাদ ও কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন হয়েছে ডিরোজিও, রামমোহন, অক্ষয় কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে। তবে সেক্ষেত্রে খানিকটা অনুঘটকের কাজ করেছিল ব্রিটিশরা। তবে আমাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে বিংশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভা নামে দুটি পরস্পর বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির আবির্ভাব হয় এবং এদের মদতে সারা ভারত জুড়ে অসংখ্য ছোট-বড় দাঙ্গা হয়। অবশেষে ভারত ভাগ হয় ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এদেশে ধর্মের সাথে রাজনীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। বর্তমানে আমরা এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। ধর্মকে পুঁজি করে কিভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা যায় আমরা তা দেশভাগের সময় থেকে দেখেছি।

এদেশে ধর্মীয় কুসংস্কার ও হিন্দুত্ববাদী চরমপন্থার বিরুদ্ধে কলম ধরতে গিয়ে একে একে খুন হন নরেন্দ্র দাভলকার, গৌরি লঙ্কেশ ও কালবুর্গীরা। সংবিধানে যে বাকস্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে তা এদেশে লজ্জিত হয় বারে বারে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে দেখতে পাই আরও ভয়ংকর চিত্র। ইসলামি মৌলবাদীদের দ্বারা বাংলাদেশে খুন হন ব্লগার ও যুক্তিবাদী লেখক অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয় দাস, নীলাদ্রি নিলয়, ওয়াশিকুর বাবু, শাহজাহান বাচ্চুরা। অনেক যুক্তিবাদী বিদেশে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছেন। পাকিস্তানের প্রফেসর হাফিজ জুনায়েদও খুন হন মৌলবাদীদের হাতে। আফগানিস্তানের কথা আর আলাদা করে কিছু বলার নেই। সেখানে তালিবানী শাসনে মেয়েদের ন্যূনতম অধিকার টুকুও নেই। আমাদের খুবই অবাক লাগে যখন দেখি ইরানী নীতি পুলিশ মাশা আমানিকে হত্যা করে শুধুমাত্র হিজাবের পাশ দিয়ে চুল দেখা যাচ্ছে, এই অপরাধে। ধর্মীয় মৌলবাদ রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট হলে এই ধারা চলতেই থাকবে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিকতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা। এ নিছকই সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় আফিম খাইয়ে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করা ছাড়া কিছুই নয়। **তাই সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গেলে সর্বাগ্রে রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করতে হবে। ধর্ম থাকবে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পরিসরে।** কোথাও সম্প্রীতি বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্র তা কঠোর হাতে দমন করবে। তবেই শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকবে। মনের মধ্যে প্রায়ই প্রশ্ন জাগে ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় শোষণ আর কতদিন ধরে চলবে। আজকের এই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে একদল মানুষ নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে তুলে ধরে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে চলেছে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্রাঙ্গণে। যা দেখে খুব হতাশ হতে হয়। এর শেষ কোথায়?

তবে আশাহত হলে চলবে না। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে সভা, সমিতি ও লেখালেখির মাধ্যমে। কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞান আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীতে কোথাও কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন একদিনে হয়নি। ক্রমাগত সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমেই পরিবর্তন সম্ভব। তাই আন্দোলন জারি রাখলে অবশ্যই আগামীতে আমরা ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাবমুক্ত, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারব। এই দেশ, এই পৃথিবী অবশ্যই একদিন 'শিশুর বাসযোগ্য হবে'। ■

সমীক্ষা ঃ

বেলগাছিয়া ভাগাড় – শাসকের পরিবেশ প্রেমের প্রকৃত রূপ – একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা

উত্তর হাওড়ার লিলুয়া থানার অন্তর্গত বেলগাছিয়া অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে সুবিশাল আবর্জনার স্তরের একাধিক পাহাড়। যার এক একটির উচ্চতা প্রায় দশতলা বাড়ির সমান। স্থানীয় মানুষদের কাছে যা 'বেলগাছিয়া ভাগাড়' নামে পরিচিত। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নিত্যদিনের সমস্ত বর্জ্য প্রতিদিন জমা হয় এই জায়গায়। এই গত ২০শে মার্চ, ২০২৫ ভোরবেলায় ওই ময়লার স্তূপে বিশাল ফাটল দেখা যায় ও বেশ কয়েকটি জায়গায় ধ্বস নামে। যার প্রভাবে আশপাশের বস্তি অঞ্চলের বহু বাড়ি ভেঙে পড়ে, বহু বাড়ির মেঝেতে ফাটল দেখা যায়, কংক্রিটের রাস্তা ভেঙে ছারখার হয়ে গেছে, কোথাও কোথাও রাস্তা ভেঙে মাটি থেকে প্রায় ৫/৬ ফুট উপরে উঠে গেছে। এলাকায় বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে বলে খবরে প্রকাশ। মাটির নীচে সৃষ্ট চাপ সহ্য করতে না পেরে মাটির দশ ফুট নীচের জলের পাইপ ভেঙে গিয়ে মাটির উপরে উঠে গেছে, একের পর এক ইলেক্ট্রিক পোস্ট ভেঙে মাটির ষাতে মিশে গেছে, নিকাশি ড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলস্বরূপ, বিস্তীর্ণ এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ, বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই, ঐ এলাকাসহ আশেপাশের গোটা এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে রাস্তায় রাস্তায় এমনকি বাড়ির মধ্যেও নোংরা জল জমে যাচ্ছে। স্তূপের নিকটবর্তী স্থানে একটি সিএমডিএ অফিস বিল্ডিং এর প্রভাবে ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। এলাকার মানুষদের যাদের ঘর ভেঙে গেছে ও যাদের ঘর বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে তাদের খোলা আকাশের নিচে কাটাতে হচ্ছে। পৌরসভা থেকে যে পরিমাণ পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, ঘটনার দিন থেকে মানুষ নিকটবর্তী একটি স্কুলে রাত কাটাচ্ছেন, স্কুলের শৌচাগার ব্যবহার করছেন, তবে সেখানেও জল সরবরাহ নেই। এই অবস্থায় মানুষ স্নান করার কথা কল্পনায় আনতে পারছে না। সন্ধ্যার পর সারা এলাকা থাকছে অন্ধকারময়। প্রশাসনের তরফ থেকে খাবারের আশ্বাস থাকলেও তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। স্থানীয় মানুষদের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি জায়গায় দুবেলা রান্নার আয়োজন করে কোন রকমে দিন গুজরান করছেন তারা। এই অবস্থার মধ্যেও ভাগাড়ে ময়লা ফেলার কিন্তু কোন বিরাম নেই। বিশেষজ্ঞদল বলেছেন এখুনি এর প্রতিকার না করলে ধ্বস আরও শক্তিশালী হবে, আরও অনেক বাড়ি ভেঙে পড়বে, অবস্থা আরও সংকটজনক হবে। প্রশাসনের তরফ থেকে এই অবস্থার সুরাহা কি হবে তা নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি, স্থানীয় সাংসদ এটিকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করে গেছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দফায় দফায় মিটিং হচ্ছে কিন্তু কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। মন্ত্রী আমলাসহ এলাকা পরিদর্শনরত সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। পুরমন্ত্রী ঐ এলাকাকে তিন বছরের মধ্যে সবুজ মাঠে পরিণত

●*শেষাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়* ➔

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব দ্বাদশ অংশ)

আমরা বিগত রচনার শেষাংশে দেখিয়েছিলাম, যে স্থির বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রন হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের চারিপাশে ঘুরছে। সেটা আসলে লুই ডে ব্রগলির ব্যাখ্যায় পূর্ণসংখ্যার তরঙ্গের সমষ্ঠি। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন **কণা** যেমন চলমান, তেমনি ঐ ইলেকট্রনটির সঙ্গে চলমান **তরঙ্গ**-ও রয়েছে।

লুই ডে ব্রগলির কণা-তরঙ্গ (matter wave) একটি প্রকল্প হলেও নিলস্ বোরের পরমাণু মডেলের প্রস্তাবনায় কেন স্থির বৃত্তাকার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ইলেকট্রন সাধারণ অবস্থায় অবিরত ঘূর্ণায়মান? কেন তার পরও শক্তিক্ষয় হচ্ছে না? – এসবের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এবার থেক আমাদের ধারণায় কোনো বস্তু কণাকে দেখতে হবে তার সাথে চলা তরঙ্গে (in it's associeted wave)।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই বিজ্ঞানী ডেভিসন এবং জার্মার কঠিন ও উত্তপ্ত নিকেলের ব্লকের উপর একটি ইলেকট্রন গান (বন্দুক) থেকে ইলেকট্রনের গুলি বর্ষণ করে তার বিক্ষেপন একটি ইলেকট্রন ডিটেকটর থেকে ধরে ফেলেন। তাঁদের প্রাপ্ত তথ্য শুধুমাত্র ইলেকট্রন কণার তরঙ্গ ধর্মই প্রমাণিত করলো না, ঐ তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave length) ও তাঁরা নির্ণয় করলেন। দেখা গেল পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাপ্ত ফোটন কণার তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয়ের ফর্মুলা $\lambda = \frac{h}{\gamma mv}$ -র সাথে প্রাপ্ত ইলেকট্রন কণার তরঙ্গদৈর্ঘ্য হুবহু মিলে যাচ্ছে।

মার্কিন এই বিজ্ঞানীদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে ইলেকট্রনের আবিষ্কর্তা জে. জে. থমসনের পুত্র জি. পি. থমসন একই পরীক্ষা করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এবার ডে. ব্রগলির প্রকল্প বাস্তবে আবিষ্কৃত হল।

কণার তরঙ্গ ধর্ম আবিষ্কারের পরও পাঠক মহলের অনেকাংশে কণাকে মানসিকভাবে মেনে নেওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব হলেও (কারণ এই আদি কণার সন্ধান মানুষ বহুযুগ থেকে করে আসছে, তার তরঙ্গ ধর্মকে মানসিকভাবে মেনে নেওয়াটা সুবিধাজনক হয়নি। এমনকি তরঙ্গ সর্ম্পকেও ভাবনাটা সুনির্দিষ্ট থাকে না আমাদের অনেকেরই। যেমন কোনো তরঙ্গকে মনে হয় বস্তু কণাটির গতিপথ। কিন্তু পেন্ডুলাম কিংবা নাগরদোলা, চড়কি ইত্যাদির গতি এমনই যেখানে সময়ান্তরে গতিশীল বস্তুটি (যেমন পেন্ডুলামের বব, নাগরদোলা বা চড়কিতে অবস্থানকারী) একই স্থানে ফিরে ফিরে আসে। এই গতিকে যদি লেখচিত্রে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে সময়ান্তরে আঁকা হয়, তবে এক তরঙ্গ আমরা পাই। এই তরঙ্গ কি পেন্ডুলামের বব্-এর বা নাগরদোলা/ চড়কিতে অবস্থানকারীর গতিপথ? একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন। দেখবেন ঐ লেখচিত্রে আঁকা তরঙ্গ তার সময়ের সাপেক্ষে গতিশীল অবস্থার বিভিন্ন ভৌত ধর্মকে (অবস্থান, ভরবেগ ইত্যাদিকে) তুলে ধরছে মাত্র। অর্থাৎ কোনো গতিশীল বস্তুর গতিশীল অবস্থাকে ঐ তরঙ্গ বর্ণনা করছে। লেখচিত্রে আঁকা তরঙ্গ যেমন ঐ বস্তুর গতিশীল অবস্থাকে বর্ণনা করছে, তেমনি তার সমীকরণ (wave equation)-ও অবস্থান ও সময়ের সাপেক্ষে তার গতিশীল অবস্থায় বিভিন্ন ভৌতধর্মকে ব্যাখ্যা করছে।

এবারে বস্তুটির গতির বদলে কোনো মাধ্যমের সংকোচন-প্রসারণের ফলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শব্দ তরঙ্গ প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানেও মাধ্যমের সংকোচন (ঘনীভবন) এবং প্রসারণ (তনুভবন) কে যে তরঙ্গ তুলে ধরছে সময়ের সাপেক্ষে, সেই তরঙ্গায়িত লেখচিত্র মাধ্যমের গতিপথ নয়।

আমরা এমন তরঙ্গও পেয়েছি (যেমন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ), যেখানে তরঙ্গের ছড়িয়ে পরাটা (propagation) মাধ্যমহীনভাবে এবং সেখানে প্রাপ্ত তরঙ্গের লেখচিত্র হল তড়িৎ কিংবা চুম্বক ক্ষেত্রের (electric or magnetic field) বিস্তার, কোনো বস্তুর নয়।

এখন ডে-ব্রগলির ম্যাটার ওয়েভকে তা হলে কি বলা চলে? একে কোনো সদা গতিশীল বস্তুকণার যাবতীয় সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল ভৌতধর্মের প্রকাশকারী লেখচিত্র বলা যাবে। আবার তার তরঙ্গ সমীকরণ বা ওয়েব ইকুয়েশনকে বলা যাবে সময়ের সাথে সাথে গতিশীল বস্তুকণাটির বিভিন্ন ভৌতধর্ম প্রকাশকারী একটি গাণিতিক চেহারা। এই লেখায় যতবার কণার তরঙ্গ নিয়ে আমরা চর্চা করবো, আপনারা ততবারই তাকে এই চোখেই দেখবেন।

বিগত রচনায় দেখিয়েছি এই ওয়েব ফাংশানকে Ψ [সাই]

●শেষাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায় ➔

স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের কর্মকান্ড ঃ

মধুসূদন গুপ্ত
ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতে শবব্যবচ্ছেদের পথিকৃৎ

– পঞ্চানন মন্ডল

ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে মধুসূদন গুপ্ত এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম। তিনি প্রথম ভারতীয়, যিনি বহু কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা অতিক্রম করে শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন গবেষক, যিনি বাংলার সমাজে প্রচলিত নানা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর যুগান্তকারী কাজ ভারতের আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলে।

মধুসূদন গুপ্ত ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার বৈদ্যবাটিতে, এক চিকিৎসক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে ছোটবেলায় তাঁর পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। পরে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ধীরে ধীরে চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক থাকাকালীন তিনি ছাত্রদের প্রাণীর শবব্যবচ্ছেদ শেখাতেন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাশাস্ত্রের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করতেন।

বাংলায় আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষার সূচনা

উনিশ শতকের বাংলায় সবেমাত্র আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া লেগেছে। এদেশে প্রগতিপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রামমোহন রায় ইংরেজ শাসককে চিঠি লিখলেন, "টোল মাদ্রাসার সংখ্যা না বাড়িয়ে ওদেশের মতো সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এসব বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা হোক এদেশের ছাত্রদের জন্য" (১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের চিঠি লর্ড আমহার্স্টকে)। কারণ সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসাবিদ্যাতেও এদেশে তখন চরম দূরাবস্থা বিরাজ করছে। আর এদেশীয় চিকিৎসা বলতে ছিল বংশপরম্পরায় কবিরাজি, ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। এছাড়া নানা রকম কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের কারণে চিকিৎসার পরিবেশ ছিল বড় অস্বাস্থ্যকর। এদিকে কলকাতা শহরে ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে কঠিন রোগের উপশমের ঘটনা এদেশীয়দের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। এছাড়া ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দেশ শাসনের প্রয়োজনে কিছু চিকিৎসক তৈরির বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। তাই এদেশীয়দের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষিত করার নানা উদ্যোগ চলতে থাকল। যেমন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২১ জনু 'স্কুল ফর নেটিভ ডক্টরস্' স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসায় চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে সে যুগে এদেশে শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শবব্যবচ্ছেদ শিখতে ভেড়া ব্যবচ্ছেদ করে দেখানো হত।

কিন্তু এইভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াবার পদ্ধতি যে যথেষ্ট ছিল না, এটি বুঝতে ইংরেজ শাসকদের অসুবিধা হয়নি। তাই, এই শিক্ষার যাচাইয়ের জন্য লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মি. জে. গ্রান্টকে সভাপতি করে এবং জে. সি. সাদারল্যান্ড, সি. জি. ট্রাভলিয়ন, টমাস স্পেন, এম. জে. ব্রাসলি এবং বাবু রামকমল সেন প্রমুখদের নিয়ে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করে। প্রচলিত মেডিক্যাল শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাগুলির উপর প্রশ্ন তুলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের উপযুক্ত মেডিক্যাল কলেজ গঠনের সুপারিশ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে লর্ড বেন্টিংক এর সুপারিশ মতো ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি এক আদেশবলে সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসার চিকিৎসাশিক্ষা বিভাগের অবসান হয়, অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্ত শর্ত মেনে চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখাবার জন্য মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনা হয়। এইভাবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রথম প্রচেষ্টা এদেশে শুরু হলো।

সমস্যায় শবব্যবচ্ছেদ

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এদেশে যখন প্রথম মেডিক্যাল কলেজ তৈরির সব আয়োজনই সম্পূর্ণ হতে চলেছে তখন কলেজ কর্তৃপক্ষের বুঝতে অসুবিধা হলো না তাঁদের সামনে দুর্লঙ্ঘ্য এক

বাধা উপস্থিত। কোনো ছাত্র কলেজে ভর্তি হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিল। ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল কলেজের জন্য বাড়ি নির্দিষ্ট হয়েছে। বিলেত থেকে চিকিৎসক-শিক্ষক আনা হয়েছে। এবার যদি ছাত্র না আসে তাহলে সব আয়োজনই যে ব্যর্থ। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এদেশের গণ্যমান্য অনেকে জানালেন যে বিধর্মী বিলেতি অধ্যাপকদের নির্দেশে শবব্যবচ্ছেদ করলে এদেশীয় ছাত্র জাতিচ্যুত হবে। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে শবব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ। তখনকার সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, মৃতদেহ স্পর্শ করা পাপ ছিল।

বাস্তবে হলোও তাই। মেডিক্যাল কলেজ চালু হলো বটে কিন্তু শবব্যবচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে বড় বাধা দেখা দিল। কেউ মৃতদেহ কাটতে রাজি হচ্ছিল না, কারণ এতে জাতিভ্রষ্ট হওয়ার ভয় ছিল। আগেই উল্লেখ করেছি উনিশ শতকের সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চা ছিল সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে, শবব্যবচ্ছেদ (ডিসেকশন) ছিল এক গভীর ট্যাবু। অনেকেই বিশ্বাস করত, মৃতদেহ স্পর্শ করলে জাত নষ্ট হয় এবং পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

মেডিক্যাল কলেজে

ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মধুসূদন গুপ্ত

এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন ডেভিড হেয়ার, যিনি ভারতের আধুনিক শিক্ষার একজন প্রধান পথিকৃৎ। তিনি মধুসূদন গুপ্তকে এই কাজে যুক্ত করেন এবং শাস্ত্র থেকে প্রমাণ খুঁজতে বলেন যে, হিন্দু ধর্মে শবব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ নয়। একই সঙ্গে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। মধুসূদন গুপ্ত এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রায় একা লড়াই করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যান।

১. শাস্ত্র ও যুক্তির ভিত্তিতে কুসংস্কারের প্রতিবাদ

যেহেতু হিন্দু ধর্মে মৃতদেহ স্পর্শ করাকে অপরাধ হিসেবে দেখা হতো, তাই মধুসূদন গুপ্ত প্রথমেই হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ঘেঁটে দেখেন যে, কোথাও শবব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা হয়নি। তিনি ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং দেখান যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য মৃতদেহ ব্যবহার করা পাপ নয়। বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি করতে হলে এটি অপরিহার্য।

ডেভিড হেয়ারের পরামর্শে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শবব্যবচ্ছেদে কোনো বাধা নেই। যদিও বেশিরভাগ পণ্ডিত রাজি হননি, তবে এই প্রচেষ্টার ফলে সমাজের শিক্ষিত অংশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়।

২. নিজের হাতে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করে সাহসিকতার পরিচয়

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের আগে কোনো ভারতীয় চিকিৎসক মৃতদেহ কাটার কথা কল্পনাও করতে পারেননি। যখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল, তখন ডেভিড হেয়ারের অনুরোধে মধুসূদন গুপ্ত এগিয়ে আসেন। অবশেষে সেই প্রতিক্ষিত দিনটি এল ১০ জানুয়ারি, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ। কলিকাতার বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। ক্যালকাটা ফোর্ট থেকে তোপধ্বনি হল। শুরু হল এদেশে মেডিক্যাল ছাত্রদের প্রয়োজনে শবব্যবচ্ছেদ অনুষ্ঠান। শব ব্যবচ্ছেদকারী শিক্ষক হলেন বাঙালি অ্যানাটমি বিশারদ মধুসূদন গুপ্ত। আধুনিক যুগের প্রথম ভারতীয় যিনি শবব্যবচ্ছেদ করলেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে এবং দেখতে চাইলেন যে, শবব্যবচ্ছেদ কেবল বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের জন্য করা হয়, এতে ধর্মের কোনো ক্ষতি হয় না।

তবে ঘটনাটি শুধুমাত্র শবদেহ কাটাছেঁড়া ছিল না বা ছিল না ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে শুধু এক ঐতিহাসিক ঘটনা! আসলে সেদিন ছিল এক প্রচলিত কুসংস্কার ভেঙ্গে মানব কল্যাণে এক মাইলফলক স্থাপনের দিন। সেদিন মধুসূদন গুপ্ত এদেশের বহুশত বছরের এক কুসংস্কার, অন্ধসংস্কারকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই আধুনিক ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১০ জানুয়ারি দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, আর একই সঙ্গে লেখা থাকবে মধুসূদন গুপ্তের নাম।

এরপর মধুসূদন গুপ্তের প্রেরণায় শবব্যবচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসেন মেডিক্যাল কলেজের চারজন চাত্র রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত, উমাচরণ শেঠ এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। দিনটি ছিল একই বছর, অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রিস্টব্দের ২৮ অক্টোবর। এরপর কুসংস্কারের বাধা ডিঙিয়ে এদেশীয় ছাত্রদের মধ্যে শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা শিখতে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। পুরোনো একটি তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ৬০টি শবদেহ, পরবর্তী বছরগুলিতে এই সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে শবব্যবচ্ছেদ করা শবের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে যায়। মধুসূদন গুপ্তের এই কাজের জন্য তাঁকে খেসারতও দিতে হয়েছিল তখনকার সমাজের কাছে। এবার সে কথায় আসছি।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও বাধা

১. জাতিচ্যুত হওয়া ও সামাজিক বয়কট

শবব্যবচ্ছেদের পর সমাজের রক্ষণশীল অংশ মধুসূদন গুপ্তের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখায়। তাঁকে জাতিচ্যুত ঘোষণা করা হয় এবং তাঁকে সামাজিক বয়কট শুরু হয়। সেই সময় জাতিচ্যুতি খুব বড় শাস্তি ছিল, কারণ জাতিচ্যুত মানে – ব্যক্তি তাঁর পরিবার, সমাজ ও ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন।

২. অপমান ও হুমকি সত্ত্বেও সংগ্রাম অব্যাহত রাখা

শুধু জাতিচ্যুত নয়, মধুসূদন গুপ্তকে শারীরিক ও মানসিকভাবে

নিগ্রহ করা হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে সমাজে নানা ধরনের গুজব রটানো হয়, যেমন – তিনি ইংরেজদের হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চাইছেন, তিনি পরজীবীদের মাংস খান ইত্যাদি। এমনকি অনেক জায়গায় তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু এসব বাধা তাঁকে দমাতে পারেনি। বরং তিনি আরও বেশি করে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রচারে মনোযোগী হন এবং ছাত্রদের এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। আগেই বলেছি ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বছরে প্রায় ৫০০টি শবব্যবচ্ছেদ করা হতে থাকে।

প্রগতিশীল সমাজ গঠনের উদ্যোগ

১) নারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে গবেষণা

শুধু শবব্যবচ্ছেদই নয়, মধুসূদন গুপ্ত নারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও গবেষণা করেছিলেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন, অধিকাংশ ভারতীয় মেয়ের রজঃস্রাব শুরু হয় ১২-১৩ বছর বয়সে এবং ধনী পরিবারের মেয়েদের মধ্যে এটি কিছুটা আগেই শুরু হয়, যা পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। এই গবেষণা তৎকালীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

২) শিক্ষার প্রসার

মধুসূদন গুপ্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুসংস্কার দূর করতে হলে শিক্ষার বিকাশ প্রয়োজন। তাই শুধু ইংরেজি ভাষাতেই নয়, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাতেও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই তিনি মেডিক্যাল কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় চিকিৎসাশিক্ষার জন্য উদ্যোগ নেন। তিনি ইংরেজি চিকিৎসাবিজ্ঞানের বেশ কিছু বই বাংলায় ও সংস্কৃতে অনুবাদ করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'লন্ডন ফার্মাকোপিয়া' এবং 'অ্যানাটমি' অর্থাৎ 'অঙ্গসংস্থানবিদ্যা'। এর ফলে সাধারণ ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারণা ছড়িয়ে পড়ে।

আগেই বলেছি শবব্যবচ্ছেদের কারণে তৎকালীন সমাজ তাঁকে কখনোই পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। তবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ মেডিক্যাল কলেজের ডেমনস্ট্রেটর পদে বহাল করেন। কিছুদিনের মধ্যে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষায় বসেন এবং ডাক্তারি ডিগ্রি পান এবং এই কলেজের নবগঠিত হিন্দুস্থানি শ্রেণীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদ পান। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সাব-অ্যাসিসপ্টেন্ট সার্জেন পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হলে মধুসূদনকে এই বিভাগের সুপার পদ দেওয়া হয়।

অকাল মৃত্যু

এরপর কোনো এক সময় তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই কারণে তাকে শবব্যবচ্ছেদ থেকে বিরত থাকতে বলা হয় কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শবব্যবচ্ছেদ চালিয়ে যান। একসময় তাঁর হাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে এবং সেটি গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে 'সংবাদ ভাস্কর' লিখেছিল (২২ নভেম্বর, ১৮৫৬); "মধুসূদনবাবু এতদ্দেশীয় ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ব্যবসায়ী-গণের আদিপুরুষ ছিলেন। এতদ্দেশীয়রা বিশেষত হিন্দুজাতিরা মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন দূরে থাকুক পিতামাতাদি আত্মীয় লোকের মৃত্যু হইলে যে স্থানে শব রাখে সে স্থান পর্যন্ত ধৌত করেন। শব লইয়া গেলে বহির্ভার পর্যন্ত গোময় জলের ছিনা দেন। ... মধুসূদনবাবু সেই জাতির মধ্যে সর্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটি কাজে সুপণ্ডিত হইয়াছেন।"

মধুসূদন গুপ্তের মৃত্যুর পর মেডিক্যাল কলেজের একটি বিল্ডিং-এর একটি হলঘরে একটি শ্বেতপাথরের ফলকে তাঁর কীর্তিকথা খোদাই করা হয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যক্ষ ডা. টি. ডব্লু. উইলসন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক রিপোর্টে মধুসূদন সম্পর্কে শিক্ষা অধিকর্তাকে জানান ঃ " বাবু মধুসূদন গুপ্ত বাংলা ও হিন্দুস্থানি শ্রেণীর লেকচারার হিসাবে ২২ বছর কলেজের সেবা করার পর গত ১৫ নভেম্বর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর নিকট তাঁর দেশবাসী কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবেন। তিনি পথিকৃৎ হিসাবে কুসংস্কারের জঙ্গলে পথ পরিষ্কার করেছেন যে পথে অন্যরা সফলভাবে অগ্রসর হচ্ছেন।" (অনুদিত)

স্মরণীয় তিনি বরণীয় তিনি

মধুসূদন গুপ্ত ছিলেন এক নির্ভীক চিকিৎসক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি যুক্তি, গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি মানবজীবনের উন্নতির পথে বাধা হতে পারে না। তাঁর এই সংগ্রামের ফলেই ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আজ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন যে, সাহস, শিক্ষা ও বিজ্ঞানচেতনার মাধ্যমে কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব। এজন্য মধুসূদন গুপ্তের নাম চিরকাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ■

তথ্যসূত্র ঃ–

১) বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা, বলাকা, ২০০৯

২) বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি বিজ্ঞানী, রণতোষ চক্রবর্তী, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ২০১৩

৩) উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা, বিনয়ভূষণ রায়, ১৯৮৭

৪) চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালি, অরুণকুমার চক্রবর্তী, ২০০১

●৩৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

বেলগাছিয়া ভাগাড় – শাসকের পরিবেশ প্রেমের প্রকৃত রূপ

করবেন আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু এখন ঘরছাড়া মানুষগুলোর কি হবে তার কোন দিশা দিতে পারেননি। সব মিলিয় এলাকার দুর্গন্ধময় বাতাসে কেবলই হাহাকার আর কান্নার রোল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন এলাকার ডাম্প করা বর্জ্যের ওজন মাটির সহনশীলতাকে অতিক্রম করে গেছে বহুদিন আগেই। সাধারণত বায়োডিগ্রেডেবল বর্জ্য মাটিতে উপস্থিত জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হয়ে গিয়ে অন্যান্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় ও ওজন হ্রাস করে। মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি করে। বর্জ্যের পরিমাণ অত্যাধিক বেশি হলে মাটির জীবাণুর পক্ষে তা বিয়োজন করা সম্ভব হয় না, পাশাপাশি বিয়োজনের ফলে সৃষ্ট মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্যাস মাটির নিচে জমতে থাকে ও ধীরে ধীরে মাটির নিচের চাপ বৃদ্ধি করতে থাকে। সেই চাপের শক্তি যে কতটা হতে পারে তা ঐ এলাকা পরিদর্শন করলেই বোঝা যায়। অন্যদিকে, প্লাস্টিক, রাবারের মতো নন-বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ পরিস্থিতিকে আরও মারাত্মক রূপ দেয়। তাই বর্জ্য থেকে বায়োডিগ্রেডেবল ও নন-বায়োডিগ্রেডেবল অংশকে আলাদা করে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ করার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এর সমাধান করাই হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা প্রশাসনকে আগেই সর্তক করেছিল কিন্তু সেই পরামর্শে সরকার কর্ণপাত করেনি। এটাই হল শাসকশ্রেণীর প্রকৃত পরিবেশপ্রেমের নমুনা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে ও বর্জ্য থেকে উৎপন্ন বহু উপজাত সামগ্রী মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানের এই উদ্ভাবন পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হলেও আমাদের দেশে তা কেন হয় না? এই প্রশ্নে শাসকশ্রেণীর সাথে মুখে কুলুপ এঁটেছে তাদেরই ঔরসজাত বাঘা বাঘা সব পরিবেশবাদীরা।

এলাকার প্রবীন মানুষরা জানালেন, 'এই অঞ্চলটি বহু পূর্বে ছিল সবুজে ঢাকা মাঠ। স্থানীয় মানুষ এখানে চাষবাসও করতেন একসময়। তাদের চোখের সামনেই ধীরে ধীরে এলাকাটি ভাগাড় হয়ে উঠলো। বর্তমান ও অতীতের সব সরকার এদের এলাকাছাড়া করতে চেয়েছে। আগের সরকার এলাকা খালি করার জন্য মানুষকে গৃহবন্দী করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, চলেছিল পুলিশ-নির্যাতন। আজও দুর্ঘটনার ভয় দেখিয়ে অন্যত্র চলে যেতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কিন্তু এলাকার মানুষ নিজের একমাত্র সম্বলটুকু ছেড়ে যেতে নারাজ। তারা জানালেন, তাদের অধিকাংশেরই কোন স্থায়ী রোজগার নেই, কেউ কেউ লাগোয়া ক্ষুদ্রশিল্পে কাজ করেন, মহিলারা কেউ কেউ গৃহ পরিচারিকার কাজ করেন এবং একটা বড় অংশ ঐ স্তুপে ফেলে যাওয়া ময়লা থেকে সংগ্রহ করা প্লাস্টিক, রাবার, লোহা ইত্যাদি বিক্রি করে যৎসামান্য কিছু রোজগার করে কোনরকমে পেট চালান। ওখানকার মানুষ জানালেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বলা হচ্ছে, কিন্তু স্থায়ী বাসস্থান না দিলে আমরা যাই কিভাবে?' ■

●৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল। এর সাহায্যে বস্তুকণার যে ধর্মগুলো জানা সম্ভব এবং যেগুলো জানা যায়নি – তাদের একত্রে প্রকাশিত করা হয়। কারণ এই ওয়েভ ফাংশান সময়ের সমস্তটাকেই একত্রে ধরার চেষ্টা করে। তেমনি কণা তরঙ্গ (matter wave), অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সময়ের সকল সারণীতে কণাটির অবস্থান সহ অন্যান্য ভৌতধর্মের প্রকাশ।

সময়ের এই অসীম বিস্তৃত সারণীতে যদি কোনো এক ক্ষণে নজর করি তবে কণাটিকে খুঁজে পাবো, কিন্তু তখনই ঐ তরঙ্গটি হবে অদৃশ্য। এই কথাটাকেই অন্যভাবে বললে হয় তরঙ্গটিকে আঞ্চলিক বা localised করা।

এর বিপরীতে তরঙ্গটিকে যদি সংকীর্ণ গন্ডিতে না দেখে দৃষ্টি প্রসারিত করি, ধরা যাক এতটাই প্রসারণ হয় যে মনে হয় সমগ্র তরঙ্গ-ই দৃশ্যমান (এটা সম্ভব কেবলমাত্র চলরাশি সমন্বিত ওয়েভ ফাংশানকে সাধারণভাবে বিচার করলে)। তখন ওয়েভ ফাংশানের সম্ভাব্য সকল অবস্থানে তার ভৌতচরিত্র আমরা একত্রে লক্ষ্য করি। এসময় কণাটি হয় অদৃশ্য। এ যেন গাছকে না দেখে, তার প্রস্ফুটিত বা ঝড়ে পরা পাতা-ফুল-ফল – তাকে ঘিরে বেঁচে থাকা বা মারা যাওয়া সকল জীবকূলকে আদালা করে না দেখে সমগ্র জঙ্গলকে সময়ের অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত একত্রে দেখা।

সময়ের সকল পরিমাপে বস্তুকণার সকল ভৌতধর্মকে প্রকাশকারী কণাতরঙ্গ ও গতিশীল কণাটি এই বৈপরীত্ব নিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে একত্রে অবস্থানকারী। আলোক তরঙ্গের কণা ধর্মের মতো বস্তুকণার তরঙ্গ ধর্ম দুই বিপরীতের অবিচ্ছিন্নতা। (ক্রমশ)

কবিতা ঃ

পুণ্যের লোভ

– তন্ময়

হ্যামলিনের বাঁশির সুরে ইঁদুর ধরার কল
পিলপিলিয়ে ছুটছে সব পুণ্যলোভীর দল,
যুক্তিবুদ্ধি শিকেয় তুলে ধর্ম নেশায় মজে
কেউ চলেন কুম্ভস্নানে, কেউ বা চলেন হজে,
পুণ্যস্রোতে গা ভাসিয়ে জীবন হবে ধন্য
ছু মন্তর, এক নিমেষে পাপের ঘড়া শূন্য,
পুণ্যস্থানে ব্যবসা জমে, যা খুমি দাম হাঁকে
পণ্য বিকোয়, ধর্ম বিকোয়, পুণ্যার্থী ঠকে,
ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট, ঠিকানাহীন লাশ
পরোয়া নেই, বেহেশতে বা স্বর্গে হবে বাস,
ভক্তিরসে ডুবিয়ে রেখে রাষ্ট্র খেলে পাশা
ভুলিয়ে রাখে অসাম্য আর শোষণ সর্বনাশা,
এ খেলা যেদিন বুঝবে মানুষ, সঙ্গী হবে যুক্তি
পাপ পুণ্যের হুজুগ থেকে সেদিন হবে মুক্তি।

কুম্ভস্নানের উপগ্রহ চিত্র

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা

Registration No.: SO197407 of 2012-13

৯ই ফেব্রুয়ারি কলেজ স্ট্রীট থেকে আর জি কর মৌন মিছিল

৯ই ফেব্রুয়ারি বনগাঁ'য় দ্রোহের আলো

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে বক্তব্য রাখছেন রিক্সাচালক মিঠু পন্ডিত

৯ই ফেব্রুয়ারি বেহালায় দ্রোহের আলো

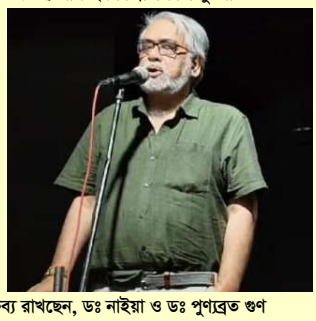

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে বক্তব্য রাখছেন, ডঃ নাইয়া ও ডঃ পুণ্যব্রত গুণ

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে বক্তব্য রাখছেন, ডঃ অর্ণব সেনগুপ্ত

লক্ষীকান্তপুরে ৯ই মার্চ ২০২৫

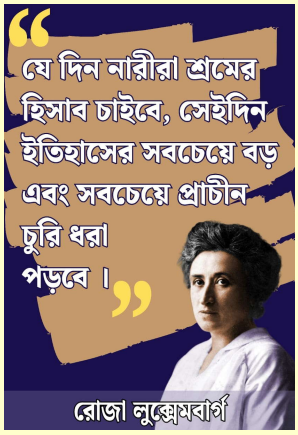

৩রা ফেব্রুয়ারি কোনা স্কুলে বিজ্ঞান মনস্কর প্রদর্শনী

২৩শে মার্চ পাথরপ্রতিমায় শহীদ দিবস পালন

২৩শে মার্চ বেহালায় শহীদ দিবস পালন

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮

Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.org